# ইসলামের নামে ভ্রান্ত আক্বীদা ও তার নিরসন

মুফতী মনসূরুল হক

হযরতওয়ালার "কিতাবুল ঈমান" কিতাবের
৩য় অধ্যায় থেকে সংকলিত

মাকতাবাতুল মানসূর

www.darsemansoor.com

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

## সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| ইসলামের নামে ভ্রান্ত আক্বীদা | ১ |
| ভ্রান্ত আকীদাসমূহ | ২ |
| আল্লাহ তা‘আলার ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা | ৪ |
| ফেরেশতাগণের ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা | ১০ |
| আসমানী কিতাবসমূহের ব্যাখ্যা ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা | ১৪ |
| নবীগণের ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা | ১৯ |
| কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা | ২৬ |
| তাকদীরের ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা | ৩২ |
| জরুরী হুশিয়ারি | ৩৯ |
| আরো কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদা | ৪০ |
| ভ্রান্তি নিরসন | ৪০ |


হযরতওয়ালার “কিতাবুল ঈমান” কিতাবের ৩য় অধ্যায় থেকে সংকলিত

GET IT ON Google Play

www.darsemansoor.com

Download on the App Store

## ইসলামের নামে ভ্রান্ত আক্বীদা

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এ পথে চল। খবরদার! অন্যান্য পথ অবলম্বন করো না। অন্যথায় সে সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত ও সর্তক হও। [সূত্র : সূরা আনআম, আয়াত-১৫৩]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈল ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল, তেমনিভাবে আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। একটি জামা'আত ব্যতীত তাদের সকল ফিরকাই জাহান্নামী হবে। সাহাবায়ে কিরাম রাযি. প্রশ্ন করলেন, সেই জামা'আত কোনটি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, আমি ও আমার সাহাবীগণের তরীকার ওপর যারা থাকবে। [সূত্র: তিরমিযী খণ্ড-২, পৃষ্ঠ-৯২ ও মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৩০।]

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আখিরী উম্মত ঈমান ও আকীদার দিক দিয়ে ৭৩ ফিরকা বা দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাদের মধ্যে শুধু মাত্র একটি জামাত জান্নাতী হবে এবং অবশিষ্ট ৭২টি ফিরকা ঈমান ও আকীদার ত্রূটির কারণে জাহান্নামী হবে।

বাস্তবতার কারণে এ কথা প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিফলিত হয়ে গেছে। উম্মতের মধ্যে বহু গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট দলের উদ্ভব হয়েছে। এদের কোন কোনটা সুস্পষ্ট কুফরী আক্বীদা অবলম্বন করার দরুন দ্বীন ও ঈমানের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণভাবে খারিজ হয়ে কাফির সাব্যস্ত হয়েছে। আর কোন কোনটা পথচ্যুত, গোমরাহ ও বিদ'আতী। তারা কাফির না হলেও নিশ্চিতভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা আহলে হকের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গেছে।

আহলে হকভুক্ত কোন ব্যক্তি আকীদার ত্রূটির কারণে জাহান্নামী হবে না, তবে তাদের মধ্যে হতে কেউ কেউ আমলের ত্রূটির কারণে সাময়িকভাবে জাহান্নামী হতে পারে। আর অবশিষ্ট বাতিল ফিরকাসমূহ আক্বীদা ও আমল উভয় প্রকার ত্রুটির কারণে জাহান্নামী হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে প্রতিফলন হয়েছে। তিনি যে সহী ঈমান ও আক্বীদা উম্মতের সামনে পেশ করেছিলেন এবং যে নকশার ওপর সাহাবায়ে কিরামকে রাযি. তৈরী করেছিলেন, পরবর্তীতে মুসলমান নামধারী অনেক লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং দ্বীনে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সহীহ আক্বীদাসমূহকে পরিবর্তন করে তার স্থলে ভ্রান্ত আকীদার প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছে। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রণিধানযোগ্য, শেষ যামানায় অনেক দাজ্জাল-কাযযাবের আবির্ভাব ঘটবে, তারা দ্বীনের নামে এমন অনেক কথা প্রচার করবে, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা কোনদিন শোননি। তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে, যাতে তারা তোমাদের গোমরাহ না করে ফেলে। [সূত্র: মুসলিম শরীফ। খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৯।]

প্রত্যেক যুগেই অনেক মূর্খ ও বে-ইলম লোকেরা ইসলামের নামে আবিষ্কৃত সেসব নতুন নতুন ভ্রান্ত আক্বীদা গ্রহণ করে দ্বীন-ঈমান নষ্ট করেছে এবং আহলে হকের জামা‘আত থেকে খারিজ হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় বর্তমান যুগে ফিতনা-ফাসাদ অনেক বেশি হওয়ায় এবং অধিকাংশ লোক দ্বীনি ইলমের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকায় তাদের অনেকেই ইসলামের নামে সেসব বাতিল ও ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে নিজেদের ঈমান-আক্বীদা নষ্ট করে ফেলেছে।

তবে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এ ব্যাপারে যে পরিমাণ কিতাবপত্র রচনা ও যতটুকু আলোচনা-পর্যালোচনা দরকার ছিল, তা হয়নি। অপরদিকে মধুর নামে বিষ পান করানোর ন্যায় বাতিল আক্বীদায় ভরপুর বই পুস্তকে বাজার ছেয়ে গেছে। বাতিল আকীদার প্রচার ও প্রসার হচ্ছে খুব দ্রুত গতিতে। এহেন নাজুক মুহূর্তে মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাযতের লক্ষ্যে সহীহ আক্বীদা বর্ণনার পাশাপাশি ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহকে আলোচনা অতীব জরুরী মনে করে সেগুলোর আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। যাতে করে কোন মুসলমান দ্বীনের নামে সেসব ভ্রান্ত আক্বীদা কোনক্রমেই অন্তরে স্থান না দেন। আর খোদা না করুন, যদি কোন মুসলমান সহীহ ইলম না থাকার দরুন ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে থাকেন, তাহলে তিনি যেন সাথে সাথে সেগুলো অন্তর থেকে দূর করে খালিসভাবে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে তাওবা করে সহীহ আক্বীদা দিলের মধ্যে বদ্ধমূল করে নেন।

সাবধান! দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ জিদ বা হঠকারিতার আশ্রয় নেয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কবরে যাওয়ার পরই ঈমানের পরীক্ষা নেওয়া হবে। এ পরীক্ষায় যে ব্যক্তি উত্তীর্ণ হবেন, তিনি সামনের সকল পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়ে জান্নাতী হবেন। আর উক্ত পরীক্ষায় যে অকৃতকার্য হবে, সে সামনের সকল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে জাহান্নামী সাব্যস্ত হবে। আর এ পরীক্ষা একবারই হবে, দুনিয়ার পরীক্ষার ন্যায়

একবার ফেল করে দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ সেখানে নেই। আর এ পরীক্ষা প্রত্যেককে দিতে হবে এবং যার পরীক্ষা তাকেই দিতে হবে। সেখানে কোন ওলী-বুযুর্গ, পীর-আউলিয়া, রাজনৈতিক নেতা বা দলপতি কেউ কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করে পাশ করিয়ে দিতে পারবে না। এ ধরণের কোন সুযোগ সেখানে নেই।

দুনিয়াতে কোন নেতার প্রভাবে বা ব্যক্তিগত স্বার্থে ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী হয়ে পরকালে বুদ্ধি খাটিয়ে সঠিক উত্তর দিয়ে পাশ করে ফেলবে, এমন ধারণা করাটাও একেবারে অর্থহীন। যে ব্যক্তি যে আকীদার ওপর জীবন কাটিয়েছেন এবং যে আকীদার ওপর মৃত্যুবরণ করেছে, পরকালের পরীক্ষার সময় তদ্রূপ উত্তরই তার মুখ থেকে বের হবে এবং সেই উত্তরের ওপর ভিত্তি করে তার জান্নাত কিংবা জাহান্নামের ফায়সালা হবে। তাই সময় থাকতে এখনই যার যার ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমলের ত্রূটি সংশোধন করে নেয়া বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান সমাজে যেসব ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো। এথেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

## ভ্রান্ত আকীদাসমূহ

### আল্লাহ তা‘আলার ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা

**ভ্রান্ত আক্বীদা-১:** ইসলামের নামে একটি গোমরাহ ফিরকা এরূপ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ ও রাসূল একই সত্ত্বাবিশেষ। অর্থাৎ যিনি রাসূল, তিনিই স্বয়ং আল্লাহ এবং তিনিই ‘মুহাম্মদ’ নাম ধারণ করে মানুষের আকৃতিতে দুনিয়ায় অবতরণ করেছিলেন। তারা আরো বলে থাকে যে, আহাদ ও আহমদ-এর মধ্যে কেবল একটি মীমের পার্থক্য। খোদা মীমের যবনিকা টেনে অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুরত ধারণ করে লোকালয়ে এসেছেন। নচেৎ উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

এ কথাটির তারা কবিতার মাধ্যমেও বলে থাকে-স্বয়ং
‘মুহাম্মদ নাম ধারণ করে কে এলোরে মদীনায়,
আসল কথা বলতে গেলে পড়বে দড়ি গলায়।’ [নাউযুবিল্লাহ]

এ ধরণের আক্বীদা সুস্পষ্ট কুফর। এরূপ আক্বীদা পোষণকারী ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা অতুলনীয়। কোন সৃষ্টিজীবের সাথে কোনভাবেই তাঁর তুলনা হতে পারে না। সে ক্ষেত্রে নবীকে সরাসরি খোদার সাথে তুলনা করা বা খোদা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একই সত্ত্বা বলা যে কত বড় জঘন্য অপরাধ

ও কুফরী আক্বীদা, তা অতি সহজেই অনুমেয়। [সূত্র: সূরা শূরা, আয়াত ১১, আকীদাদাতুত তাহাবী, পৃষ্ঠা ৩১।]

**ভ্রান্ত আক্বীদা-২:** অনেক মূর্খ লোক বিশ্বাস করে যে, ওলী-বুযুর্গ, পীর-সাধক, মাযার-দরবার প্রভৃতি মানুষের মনের মাকসুদ পূর্ণ করতে পারে, সন্তানাদি ও ধন-সম্পদ ইত্যাদি দান করতে পারে বিপদ-আপদ দূর করতে পারে। এ ভ্রান্ত আকীদার বশবর্তী হয়ে তারা বিভিন্ন পীরের নামে মান্নত ও নযর-নিয়ায করে, তাদেরকে বা তাদের মাযারকে সিজদা করে, তাদের কবর তাওয়াফ করে, তাদের কাছে প্রার্থনা করে ইত্যাদি।

অথচ মান্নত বা নযর, সিজদা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ও প্রার্থনা এ সবই ইবাদত এবং এগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। সুতরাং, এগুলো অন্যের জন্য করা কুফরী ও শিরকী কাজ। এর থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয এবং এটা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। পূর্বেই বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মাকসুদ পূর্ণ করেন, তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং একমাত্র তিনিই মানুষের সকল বিপদ-আপদ দূর করতে পারেন। এ ক্ষমতা তিনি পীর-বুযুর্গ তো দুরের কথা, কোন নবী রাসূলকেও প্রদান করেন নি। তাই কোন নবী-রাসূল, পীর-বুযুর্গ এসব ক্ষমতার কথা কখনো দাবী করেন নি, বা এগুলো বাস্তাবায়িত করে দেখাতে পারেন নি। বরং এসব ব্যাপারে তারাও আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার প্রিয় পাত্র হিসেবে তাদের অনেক দু'আ আল্লাহপাক কবুল করেছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কবুল করেন নি। যেমন, হযরত নূহ আ. তাঁর কাফির ছেলের জন্য দু'আ করেছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন নি। হযরত ইবরাহীম আ. নিজের কাফির পিতার জন্য দু'আ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন নি। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর জন্য দু'আ করেছেন, নিজের চাচা আবু তালিব এর জন্য দু'আ করেছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন নি। এ ধরণের অনেক ঘটনার বর্ণনা কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে।

সুতরাং, ইবাদত-বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোন পীর-আউলিয়া বা মাযারের ইবাদত করা সম্পূর্ণ শিরক এতে ঈমান চলে যায়। [সূত্র : সূরা আনআম, আয়াত ১৬৪, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০ আকীদাতুত তাহাবী, পৃষ্ঠা ৩১।] মোদ্দাকথা, কোন সৃষ্টজীব বা পদার্থ মা'বুদ কিংবা ইবাদতযোগ্য হতে পারে না। অতএব, যারা গঙ্গার, সূর্যের, রামের, যীশুর, কোন দেবতার, কোন পীর-পয়গাম্বরের উপাসনা বা পূজা-অর্চনা করে, তারা নির্বোধ, বেঈমান ও কাফির। উল্লেখ্য যে, গঙ্গা, সূর্য, আগুণ ইত্যাদিকে সালাম

GET IT ON Google Play
www.darsemansoor.com
Download on the App Store

করা এবং এ সবের সামনে নত হওয়াই প্রকারান্তরে এগুলোর ইবাদত করার শামিল।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-৩:** অনেকে তিন খোদা মানে, একে 'তিনে তিনে এক' বলে, হযরত উযাইর আ. কে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করে, হযরত মারিয়াম আ. কে খোদার স্ত্রী হিসেবে বিশ্বাস করে, অবতারে বিশ্বাস করে, জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশরূপে মনে করে, বা পরমাত্মাকে পরমেশ্বর মানে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খোদার আংশিক জাতি নূরের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করে।

এ সবই শিরক ও কুফর। তারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করার কারণে বেঈমান, মুশরিক, কাফির সাব্যস্ত হবে। [সূত্র : সূরা যুমার, আয়াত ৪, সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৬, আকীদাতুত তাহাবী,পৃষ্ঠা-৩০]

## ফেশেতাগণের ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা

**ভ্রান্ত আক্বীদা-৪:** ইহুদী জাতি যেমন হযরত জিবরাঈল আ. কে নিজেদের দুশমন মনে করতো, তেমনিভাবে অনেক মূর্খ মুসলমানও হযরত আযরাঈল আ. কে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং তাঁর প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখায় না। এ কারণে যে, তিনি জান কবয করেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ। তাঁরা আমাদের অনেক উপকার করেন। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করা আমাদের জন্য জরুরী। সুতরাং হযরত আযরাঈল আ. কে খারাপ ভাবা মারাত্মক ভুল। কেননা, হযরত আযরাঈল আ. আল্লাহর হুকুমের দাস। তিনি আল্লাহর নির্দেশে মাখলুকের জান কবয করেন। তিনি নিজ ইচ্ছায় কোন মানুষের জীবন হরণ করেন না। তাছাড়া একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, তিনি আমাদের পরম উপকারী। কেননা, তিনি আমাদেরকে দুনিয়ার জেলখানা থেকে পৃথক করে খোদার সান্নিধ্যে নিয়ে পৌঁছান। সুতরাং, কখনো হযরত আযরাঈল আ. কে খারাপ ভাবা উচিৎ হবে না। আল্লাহর নির্দেশে তিনি জান কবজ করেন। তাই তাঁকে খারাপ ভাবা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বলা ঈমান বিধ্বংসী কাজ। [সূত্র: সূরা বাকারাহ, আয়াত ৯৮, সূরা নিসা, আয়াত-১৩৬, আকীদাতুত তাহারী, পৃষ্ঠা ৮১।]

## আসমানী কিতাবসমূহের ব্যাখ্যা ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা

**ভ্রান্ত আক্বীদা-৫:** শি'আদের অনেক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, প্রচলিত কুরআন আসল কুরআন নয়, বরং এটি হচ্ছে পরিবর্তিত কুরআন, এর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে হযরত আলী রাযি. ও শি'আ সম্প্রদায়ের ইমামদের ব্যাপারে যেসব আয়াত ছিল, হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত উমর

রাযি. প্রমুখ সাহাবীগণ যেসব আয়াত কুরআন থেকে বাদ দিয়েছেন। আর আসল কুরআন তাদের দ্বাদশ ইমামের নিকট সংরক্ষিত আছে, যার মধ্যে সতের হাজার আয়াত রয়েছে। উক্ত ইমাম যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি আসল কুরআন সাথে নিয়ে আসবেন।

এ আক্বীদা স্পষ্ট কুফরী/আক্বীদা। যে উক্ত আক্বীদা পোষণ করবে, সে কাফির সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই কিয়ামত পর্যন্ত এর সংরক্ষণকারী। [সূত্র:সূরা হিজর, আয়াত ৯।]

**ভ্রান্ত আক্বীদা-৬:** অনেকে মনে করে যে, ইঞ্জিল শরীফ [খৃষ্টানদের ভাষায় বাইবেল] সহীহ আসমানী কিতাব এবং তা এখনো পর্যন্ত অপরিবর্তিত ও অবিকল অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং, তা বিশ্বাস করতে বা মানতে কোন অসুবিধা নেই।

এ ধরণের আক্বীদা কুফরী। কারণ, কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, পূর্বের সকল আসমানী কিতাব পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। [সূত্র : সূরা বাকারাহ, আয়াত ৭৮।] বরং বাইবেলেই এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেগুলো বাইবেল বিকৃত হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত 'বাইবেল সে কুরআন তক' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-৭:** জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ লিখেছেন যে, কুরআনে কারীমের চারটি বুনিয়াদী পরিভাষা [দ্বীন, ইবাদত, ইলাহ ও রব] রয়েছে, যার অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে সকলের নিকটই স্পষ্ট ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে শব্দগুলো তার ব্যাপক অর্থ হারিয়ে অস্পষ্ট ও সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং এ কারণে কুরআনের আসল স্প্রিট নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কুরআনী তা'লীমের তিন চতুর্থাংশেরও বেশি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। [কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তিলাহে, পৃষ্ঠা-৮,৯,১০]

এটাও মারাত্মক ভ্রান্ত আক্বীদা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুরআনে কারীমের হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর অর্থ এই যে, কুরআনের শব্দ এবং অর্থ উভয়টার হিফাযতের দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। এরূপ কখনো উদ্দেশ্যে হতে পারে না যে, তিনি শুধু বাহ্যিক শব্দগুলোর হেফাযত করবেন, আর অর্থের হেফাযত অন্যের ওপর ন্যস্ত করবেন। ফলে লোকেরা যার যার মন মতো কুরআনের অর্থ করতে থাকবে বা বুঝতে থাকবে। কুরআনের অর্থ ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা পেশ করার জন্যই আখিরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। তিনি ও দায়িত্ব সঠিকভাবে ও যথাযথরূপে পালন করে গেছেন। তাঁর পরে সেগুলোকে সাহাবীগণ রাযি. হুবহু হিফাযত করেছেন এবং পরবর্তীতে যুগের লোকদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। এরূপে তা ধারাবাহিকভাবে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের নিকট সহীহভাবে পৌছাতে থাকবে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের একটি জামা'আত কিয়ামত পর্যন্ত হকের ওপর কায়িম থাকবে। তাদেরকে হক থেকে কেউ বিচ্যুত করতে পারবে না। [সূত্র: মিশকাত, শরীফ, পৃষ্ঠা ৫৮৪।]

সুতরাং, উক্ত চিন্তাবিদের এ চিন্তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মনগড়া এবং তিনি দেড় হাজার বছর পর উক্ত চারটি শব্দের যে স্বচিন্তাপ্রসূত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শরী'আতে এ ধরণের স্বগর্হিত ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন হয়, যদি ঐ চারটি শব্দের আসল অর্থ বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দেড় হাজার বছর পর চিন্তাবিদ মহোদয় ঐ অর্থগুলো কীভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেন? এখন তো আর ওহী আসার কোন পথ নেই। এ প্রশ্নের কোন প্রকার সদুত্তর চিন্তাবিদ মহোদয় ও তার অনুসারীবর্গ কখনো যে দিতে পারেনি, আর পারবেনও না কোনদিন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-৮:** অনেক লোক এমন আছে, যারা হাদীসের গুরুত্ব অস্বীকার করে। তারা বলে থাকে যে, দ্বীনের ওপর চলার জন্য কুরআন শরীফই যথেষ্ট। হাদীসের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, হাদীস অনেক ভেজালযুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তার ওপর নির্ভর করা যায় না।

তাদের এরূপ ধারনা-বিশ্বাসও কুফরী। এ ধরণের আক্বীদা পোষণকারীরা নিঃসন্দেহে কাফির। কারণ, কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিধান মুতাবিক চলার জন্য হাদীস বা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা ও কাজের অনুকরণ ও অনুসরণ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। [সূরা নিসা, আয়াত ৮০, সূরা নাহল, আয়াত ৪৪, সূরা আহযাব, আয়াত ২১]
সুতরাং, হাদীস না মানলে মূলতঃ কুরআনকে অস্বীকার করা হয়। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করনে, আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা এ দু'টি জিনিসকে ধরে রাখবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্টই হবে না। সে বস্তু দু'টি হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত। [সূত্র : মুয়াত্তা মালিক। ]

অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কাউকে যেন আমি এ অবস্থায় না দেখি যে, তার নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন আদেশ বা নিষেধ পৌঁছার পর সে এরূপ মন্তব্য করে যে, আমি এসব হাদীস জানি না; আমি তো কুরআনে যা পাব, সে অনুযায়ী আমল করব। [সূত্র: আবু দাউদ শরীফ। খণ্ড-২, পৃষ্ঠা -৬৩২।]

**ভ্রান্ত আক্বীদা-৯:** অনেকে বলে থাকে যে, দ্বীনের ওপর চলার জন্য সরাসরি হাদীসই যথেষ্ট এবং এ জন্য চার মাযহাবের ইমামগণের থেকে কোন ইমামের

তাকলীদ করার প্রয়োজন নেই। বরং তারা ইমামের তাকলীদকে শিরক বলে মন্তব্য করে থাকে।

তাদের এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সাধারণ মুসলমান কেন, বিজ্ঞ আলেমের জন্যও সরাসরি হাদীস না বুঝে শরী-আতের ওপর চলা দুঃসাধ্য। এ জন্য সকল যামানায়ই বড় বড় মুহাক্কিক আলেমগণও মাযহাব চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে কোন এক মাযহাবের ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণ করেছেন। আর যারা কোন ইমামের তাকলীদ ব্যতীত নিজে নিজে হাদীস বুঝতে গিয়েছেন, তারা পদে পদে মুশকিলে পড়েছেন। নিজে যা বুঝতে অসুবিধা, তা অন্য বিজ্ঞের থেকে বুঝে নেয়াই শরী‘আতের নির্দেশ। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, তোমরা যদি না জান, পারদর্শী আলেমগণ থেকে জেনে নাও। [সূত্র: সূরা নাহল, আয়াত ৪৩, সুরাহ আমবিয়া, আয়াত ৭।]

উল্লেখ্য, শরী‘আতের দলিল শুধুই হাদীস নয়, বরং মাশায়িখগণের ঐকমত্যে, শরী‘আতের দলিল মোট ৪ প্রকারঃ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। পবিত্র কুরআন ও হাদীসসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করে সঠিক আমলের পথ নির্ণয়-ই হচ্ছে কিয়াস। এটা কোন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, এর যোগ্যতা যাচাইয়ে ফকীহগণের মধ্যেও কর্মপরিধি জ্ঞাপক শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যাঁরা কুরআন-হাদীস গবেষণা করে মাসলাক নির্ণয়ের মতো প্রজ্ঞা অর্জন করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামের স্বর্ণযুগের নিকটবর্তী হওয়ায় শরী‘আত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁরা যেভাবে কুরআন-হাদীস বুঝেছেন, উল্লেখিত আয়াতের ভিত্তিতে তাদের বুঝকেই গ্রহণ করা উম্মতের জন্য নিরাপদ ও আশঙ্কামুক্ত।

তাই সবাই যে যার মতো ক্ষুদ্র জ্ঞানে কুরআন হাদীসের উল্টো ব্যাখ্যা করে শরী‘আতকে যাতে মনচাহী তামাশায় পর্যবসিত না করতে পারে, এ জন্য সর্বস্বীকৃত চার মাযহাবের কোন একটির অনুসরণ করা ওয়াজিব বলে উলামায়ে উম্মতের ইজমা [ঐকমত্য] প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ইজমাকে প্রত্যাখ্যাত করে উল্টো পথে ধাবিত হওয়া কারো জন্য সমীচীন নয়। আল্লাহ তা‘আলা ইজমায়ে উম্মতকে মান্য করা জরুরী বলে ঘোষণা করেছেন। [সূত্র: সূরা নিসা, আয়াত-১১৫।]

মাযহাবের গুরুত্বের কারণেই হানাফী বিজ্ঞ ফকীহগণ মাযহার মানা ওয়াজিব বলেছেন। [সূত্র: ইমদাদুল মুফতীণ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫১, জাওয়াহিরুল ফিকাহ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৭, কিফায়াতুল মুফতী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২৫।]

এছাড়াও আমরা নিজেদের দুনিয়াবি ব্যাপারেও দেখি যে, প্রত্যেক সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্য বিজ্ঞজন থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে থাকি। দুনিয়াবি ব্যাপারে

বিজ্ঞজনের তাকলীদ যেমন জরুরী ও যুক্তিগ্রাহ্য, তেমনি আখিরাতের ব্যাপারে ফিকহে পারদর্শীগণের তাকলীদ ওয়াজিব হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

বলতে কি, যারা তাকলীদকে প্রত্যাখ্যান করে সরাসরি হাদীস বোঝাকে যথেষ্ট বলছেন, তারাও তো সেই হাদীসের ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই কোন উসতাদের নিকট শিখে বা শুনে থাকবেন। তাই এ ক্ষেত্রে সাধারণ উসতাদের নিজস্ব ব্যাখ্যার চেয়ে পারদর্শী মুহাক্কিক সাহিবে মাযহাবের গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা অধিক গ্রহণযোগ্যই বটে। সে ক্ষেত্রে তাকলীদকে শিরক বা নাজায়িয বলা বড়ই বিপজ্জনক এবং তা সাধারণ লোকদেরকে উলামায়ে কিরাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক মহা ষড়যন্ত্র বৈকি। এ ব্যাপারে সকলের সর্তক থাকা খুবই জরুরী।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-১০:** ভণ্ড পীরদের মুরিদেরা বলে থাকে যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি’রাজ রজনীতে নব্বই হাজার কালাম এনেছিলেন। এর থেকে মাত্র ত্রিশ হাজার উলামায়ে কিরাম জানেন, আর অবশিষ্ট ষাট হাজার ফকীর, দরবেশ ও খাজাবাবাগণ জানেন। যা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আলী রাযি., অতঃপর তার থেকে হাসান বসরী রহ., এভাবে ধারাবাহিকরূপে একজনের অন্তর থেকে অন্যজনের অন্তরে প্রবেশ করেছে এবং সেই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত তারা এসব জ্ঞান লাভ করেছেন। সেই ষাট হাজার কালামের ব্যাপারে আলেমগণ কোন খবরই রাখেন না। এ জন্য তারা খাজাবাবা, মাযার, ওরশ ইত্যাদির বিরোধিতা করেন।

জাহিল মুরিদদের এ আক্বীদা কুফরী আক্বীদা এবং এটা নবী পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর নিছক মিথ্যা অপবাদ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোদাপ্রদত্ত কোন হুকুম-আহকাম গোপন করেননি। [সূত্র : সূরা তাকবীর, আয়াত-২৪।]

তাছাড়া সেই যামানার লোকেরা উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে হযরত আলী রাযি.-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি তা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে বলেন, আমাকে এ ধরণের কোন কালাম দেয়া হয়নি। [সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৩০০। বুখারী শরীফ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা -২১।]

**ভ্রান্ত আক্বীদা-১১:** জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ লিখেছেন,দ্বীনের অর্থ হচ্ছে, ইসলামী হুকুমত, আর দ্বীনের মধ্যে আসল হলো জিহাদ। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত এ সবই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের ট্রেনিং কোর্স মাত্র। [সূত্র: খুতবাত ৩০৭, ৩১৫।]

এ ধরণের বহু নতুন কথা ইসলামের নামে লোকেরা সমাজে চালু করেছে। অথচ এ ধরণের নতুন কথা এবং শরী‘আতের নতুন ব্যাখ্যার কোন অবকাশ কুরআন-

হাদীসে নেই। এ ধরণের নতুন কথা ও কাজকে শরী'আতের পরিভাষায় ইলহাদ, তাহরীফ [অর্থগত বিকৃতি] এবং কোন কোনটি 'বিদ'আত' বলে । ইলহাদ তো সুস্পষ্ট কুফর। আর বিদ'আতের হাকীকত হলো, দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা এবং নিজে শরী'আত প্রণেতা সাজা। এটা এত বড় অপরাধ যে, সাধারণত এ জাতীয় গুনাহ থেকে তাওবা নসীব হয় না। (নাউযুবিল্লাহ)।

দ্বীনের অর্থ কোন হাদীসে বা তাফসীরে 'ইসলামী হুকুমত' বলা হয় নি, বা আরবী কোন অভিধানেও এ অর্থ পাওয়া যায় না। তাছাড়া দ্বীনের এই রাজনৈতিক ব্যাখ্যা মেনে নিলে মারাত্মক এক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা লক্ষাধিক নবী-রাসূল আ. কে তাঁর মনোনীত দ্বীন কায়িমের লক্ষ্যে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্য হতে সীমিত সংখ্যক নবী রাসূল আ. ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। [সূত্র: তাফসীরে মাযহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৭, আল ইলমু ওয়াল উলামা, পৃষ্ঠা ২৮৬।]

অবশিষ্ট সকলেই ইসলামী হুকুমত ও রাষ্ট্র পরিচালনা ছাড়াই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়িম করেছেন। এমতাবস্থায় দ্বীনের অর্থ যদি ইসলামী হুকুমত ধরা হয়, তাহলে বাধ্য হয়ে এ কথা মেনে নিতে হয় যে, অধিকাংশ নবী-রাসূল আ. দ্বীন কায়িমে কামিয়াব হননি। কত মারাত্মক কথা!

তাছাড়া এ কথাও সঠিক নয় যে, দ্বীনের মধ্যে আসল হলো জিহাদ। আর নামায, রোযা ইত্যাদি হচ্ছে সেই জিহাদেরই ট্রেনিং কোর্স। কুরআন, সুন্নাহ ও সকল হক্কানী উলামায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত হলো, নামযা, রোযা, হজ্ব, যাকাত এগুলো হলো দ্বীনের বুনিয়াদী ও মৌলিক ইবাদত। আর আল্লাহর জমিনে দ্বীন কায়িম করার প্রচেষ্টার নাম হলো জিহাদ। যেমন, হক্কানী উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে দ্বীনের বিভিন্ন বিভাগে সহীহভাবে যেসব মেহনত চলছে, সেসবই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, জিহাদ মূল লক্ষ্যবস্তু নয়; তবে পরিপূর্ণভাবে দ্বীন কায়িম করার উপায় ও উপলক্ষ হিসেবে ইসলামী হুকুমত কায়িম বা তার প্রচেষ্টা চালানো জরুরী। [সূত্র : কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠা ৯৯।]

মোদ্দাকথা, দ্বীনের মূল লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী। [সূত্র: সূরা যারিয়াত, আয়াত-৫৬, বুখারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা-৬।]

আর আল্লাহর বন্দেগী তথা সহীহ ঈমান ও আমলে সালিহা [যার মধ্যে ইসলামী হুকুমত কায়িমের জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শরী'আত সমর্থিত পদ্ধতিতে চালিয়ে যাওয়াও শামিল]- এর নগদ পুরষ্কার হিসেবে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে ইসলামী হুকুমত দান করেন।[সূত্র : সূরা নূর, আয়াত ৫৫।] যেমন-আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যদি ইসলামী হুকুমত দান করেন, তাহলে মুসলমানগণ সেই ইসলামী হুকুমতের মাধ্যমে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত

ইত্যাদি কায়িম করবে। সম্পূর্ণ হুকুমতকে তারা দ্বীন কায়িমের এবং জনগণের খিদমতের জন্যে কাজে লাগাবে। [সূত্র : সূরা হজ্ব, আয়াত ৪১]

আর যদি আল্লাহ তা'আলা ইসলামী হুকুমত দান না-ও করেন, তবুও মুসলমানদের সাধ্যানুযায়ী দ্বীনের কাজ করে যেতে হবে। ইসলামী হুকুমতের আশায় দ্বীনের কাজ না করে বসে থাকার কোন অনুমতি নেই।

এখন আসুন, চিন্তাবিদ মহোদয়ের কথা অনুযায়ী যদি নামায-রোযাকে জিহাদের ট্রেনিং কোর্স হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তাহলে প্রশ্ন হয়, ট্রেনিং কোর্স কি সারাজীবন এক ধরণের থাকে না ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর এর গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পায়? দ্বিতীয়ত নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদিকে ট্রেনিং কোর্স ধরা হলে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত কায়িম হওয়ার পর ট্রেনিং কোর্সের প্রয়োজন কি? তৃতীয়ত যাদের উপর কখনো জিহাদ ফরয হয় না, যেমন অন্ধ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মাযুর, তাদের ওপর নামায, রোযা ফরয হওয়ার অর্থ কী? সুতরাং উক্ত ধারণা কোনভাবেই সহীহ হতে পারে না। বরং তা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন হওয়ার কারণে সুস্পষ্ট গোমরাহী। এরূপ ধারণা থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-১২**: জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ লিখেছেন যে, কুরআনের তাফসীর করার জন্য একজন অধ্যাপকই যথেষ্ট; এজন্য আলিম হওয়া জরুরী নয়। তার এ দর্শনের ভিত্তিতে বর্তমানে অনেক জেনারেল শিক্ষিত লোকদেরকে [যারা কুরআনের সহীহ তিলাওয়াত জানে না] তাফসীর করতে দেখা যায়। সেই চিন্তাবিদ সাহেব স্বীয় তাফসীরের ভূমিকায় লিখেছেন, আমি তাফসীর লিখতে গিয়ে তাফসীরের পুরাতন ভাণ্ডার থেকে কোন সহযোগিতা নেয়ার চেষ্টা করি নি। বরং এক একটি আয়াত তিলাওয়াত করার পর উক্ত আয়াত সম্পর্কে আমার মন-মস্তিস্কে যে প্রভাব পড়েছে, আমি হুবহু তা তাফসীর হিসেবে লিখে দিয়েছি।[সূত্র : তানকীহাত-১৭৫, ২৯১]

উল্লেখিত কথাগুলো শরী'আতের দৃষ্টিতে মারাত্মক ক্ষতিকর ও ঈমান বিধ্বংসী। এ ধরণের তাফসীরকে বলা হয়, 'তাফসীর বির রায়' বা মনগড়া তাফসীর, যা সম্পূর্ণ হারাম। এভাবে পবিত্র কুরআনের তাফসীর করা, লেখা, শ্রবণ করা ও সে তাফসীর পড়া-সবই হারাম। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি নিজের রায় মুতাবিক তাফসীর করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামের মধ্যে নির্ধারণ করে নেয়। [সূত্র: তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১২৩ ও মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৩৫।]

সকল হক্কানী উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে কুরআনের তাফসীর করার জন্যে ১৫টি বিষয়ের ওপর দক্ষতা ও বুৎপত্তি অর্জন করা জরুরী। [সূত্র : মিরকাত খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯২, ইতকান, পৃষ্ঠা ১৮১।] যাতে করে আরবী ভাষার ওপর এবং

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. যে তাফসীর ধারা বর্ণনা করেছেন, তা সামনে রেখে তাফসীর বর্ণনা করা যেতে পারে। উক্ত ১৫টি বিষয়ের ব্যাপারে যার দক্ষতা ও পারদর্শিতা নেই, শরী‘আতের দৃষ্টিতে তার জন্যে তাফসীর লেখা বা তাফসীর করার অনুমতিও নেই। এরূপ ব্যক্তির তাফসীরকে ‘তাফসীর বির রায়’ বা মনগড়া তাফসীর বলা হয়। আর ঐ ধরণের তাফসীর দ্বারা মুসলমানদের মাঝে কেবলমাত্র গোমরাহী ছড়ায় এবং এর দ্বারা ইসলামের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। এটা নিঃসন্দেহে ঈমান বিধ্বংসী কাজ, যা ক্ষেত্র বিশেষে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। চিন্তাবিদ মহোদয়ের অধ্যাপকগণ ১৫টি বিষয়ের ওপর পারদর্শী হওয়া তো দূরের কথা, এ সবগুলোর নামও জানেন না, অথচ তাঁরা তাফসীর করছেন।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-১৩:** অধুনা নব্য শিক্ষিতদের অনেকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা, নামায-রোযা আদায় করা, পর্দা রক্ষা করা ইত্যাদি ফরয কাজ সমূহকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে এবং সুদ, ঘুষ, মাতা-পিতার নাফরমানী, গান-বাদ্য, সিনেমা, টিভি ইত্যাদি গুনাহের কাজকে হারাম মনে করে না।  বরং এগুলোকে মৌলভীদের বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করে।

তাদের জন্যে এসব হারাম কাজসমূহকে বৈধ মনে করা কুফরী। এর দ্বারা তারা ঈমান ও ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে এবং বাহ্যিকভাবে যতটুকু ইবাদত-বন্দেগী করছে, তা-ও কোন কাজে আসবে না। আদমশুমারীতে তাদেরকে মুসলমান শুমার করলেও আল্লাহর দরবারে তারা মুসলমানরূপে গণ্য হবে না।

জেনে রাখুন, সারা জীবন কেউ সক্ষম ফরয পালন না করে এবং গুনাহ করতে থাকে, কিন্তু কোন ফরযকে অস্বীকার না করে বা কোন গুনাহকে হালাল মনে না করে, তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হবে না; বরং সে মু‘মিনই থাকবে। তবে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের কারণে ফাসিক ও গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যে কোন একটি ফরযকে অস্বীকার করলে কিংবা হারামকে হালাল মনে করলে, তা কুফরী কাজ হবে এবং তাতে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

## নবীগণের ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা

**ভ্রান্ত আক্বীদা-১৪**: কাদিয়ানী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দাবি করেছে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী নন!। বরং তাঁর পরেও আরো নবী আসতে পারেন। এর কিছুদিন পর সে নিজেই নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে। আর অনেক মূর্খ লোক তাকে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে।

মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করা বা এরূপ সমর্থন করা প্রকাশ্য কুফর। নবুওয়াত দাবি করে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজে কাফির হয়েছে এবং এ দাবী মেনে নেওয়ার কারণে তার অনুসারীরাও কাফির হয়েছে। নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ  নবী। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। মুফতী আযম শফী রহ. তৎপ্রণীত, ‘খতমে নবুওয়ত’ নামক কিতাবে প্রায় একশটি আয়াতে কুরআনী পেশ করেছেন [সূরা আহযাব, আয়াত ৪০, সূরা বাকারাহ, আয়াত ৪] ইত্যাদি এবং দু’শর বেশি সহীহ হাদীস পেশ করেছেন। [সূত্র :বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা ৫০১] ইত্যাদি। যে গুলোর প্রত্যেকটি দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নবীই শেষ নবী এবং তাঁর দ্বারা নবুওয়াতের ও ওহীর দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া কুরআনের পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী হিসেবে আখ্যায়িত করা করা হয়েছে। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইনতিকালের পর যখন ‘মুসাইলামাতুল কাযযাব’ নবুওয়াত দাবি করে, তখন এই মর্মে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের রাযি. ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আমাদের নবীই শেষ নবী। তাঁর পরে কোনক্রমেই আর কোন নতুন নবীর আগমন ঘটতে পারে না। সুতরাং, যে কেউ এখন নবুওয়াতের দাবি করবে, সে কাফির সাব্যস্ত হবে। তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাকে কতল করা জরুরী। উল্লেখিত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কতল করে উম্মতের ঈমান হেফাযতের ব্যবস্থা করেন।

পাঠক লক্ষ্য করুন, উপরোক্ত দাবি প্রমাণের জন্যে যেখানে কুরআনের একটা আয়াতই যথেষ্ট ছিল, সেখানে প্রায় এক’শ আয়াত এবং দু’শর অধিক হাদীস প্রমাণ রয়েছে। এ কারণে বিশ্বের সকল হক্কানী উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের নবীর পরে যে কেউ নবুওয়াতের দাবি করবে, সে কাফির এবং তাকে যে ব্যক্তি নবী হিসেবে স্বীকার করবে, সেও কাফির। এমনকি মিথ্যুক নবীর নিকট তার নবুওয়াতের দলিল জানতে চাওয়াও কুফরী কাজ। কারণ দলিল-প্রমাণ চাওয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এখনো নতুন নবী আগমনের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তোমার দলিল সঠিক হলে তোমাকে নবী হিসেবে স্বীকার করা যাবে। [নাউযুবিল্লাহ]

সুতরাং, মুসলমানগণ এ ব্যাপারে খুব সর্তক থাকবেন। আহমদিয়া বা কাদিয়ানী সম্প্রদায় এখন বাংলাদেশের বড় ও প্রসিদ্ধ শহরগুলোতে তাদের অফিস খুলে আস্তানা গেড়েছে। সেখানে তারা বড় বড় অক্ষরে কালিমায়ে তায়্যিবা লিখে রেখেছে। তাদের নাম মুসলমানদের নামের মতো। তারা মুসলমানদের মতো কুরআন তিলাওয়াত করে এবং নিজেদের মর্জি মত কুরআনের ব্যাখ্যা করে। তারা

বই-পুস্তক রচনা করে বিনামূল্যে বিতরণ করে এবং নানারকম সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখায়। খবরদার ! কখনো তাদের ফাঁদে পা দিবেন না। তারা এমনও বলে যে, তোমাদের মাঝে তো হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ইত্যাদি মাযহাব রয়েছে। আহমদিয়া জামাআতও তেমনি একটি মাযহাব। এটা নির্লজ্জ মিথ্যাচার। চার মাযহাবের মধ্য মূল আকীদার বিষয়ে কোন প্রকার মতভেদ নেই। হ্যাঁ এ ধরণের মতভেদ রয়েছে যে, নামাযের মধ্যে আমীন আস্তে না জোরে পড়তে হবে, হাত বুকে না নাভির নিচে বাঁধতে হবে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কি না? ঈদে ছয় তাকবীর না বারো তাকবীর ইত্যাদি। এ ধরণের ছোটখাট কয়েকটি মাসআলা নিয়ে কেবল তাদের মধ্যে মতভেদ, আর এসবই আমলের সাথে সম্পর্ক রাখে, ঈমান-আকীদার সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই, ঈমান-আকীদার ব্যাপারে সকল মাযাহাবই এক। সুতরাং সাবধান! আহমদিয়া জামা'আত কখনো হানাফী, শাফেঈ মাযহাবের মতো নয়। বরং তারা ভ্রষ্ট ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মতো কাট্টা কাফির ও বেঈমান।

তারা বলে থাকে যে, আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাতামুন নাবিয়্যীনরূপে বিশ্বাস করি, বরং আমাদের আকীদার সাথে দ্বিমত পোষণকারীদের চেয়ে এক'শ গুণ বেশি বিশ্বাস করি। কিন্তু খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের অর্থ-শেষ নবী নয়। কারণ এ অর্থ গ্রহণ করার দ্বারা মূলত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আধ্যাত্মিক ত্রূটি ও অসম্পূর্ণতা স্বীকার করা হয়।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের এরূপ উক্তিও একটি মারাত্মক ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ বহু হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে খাতামুন নাবিয়্যীন হিসেবে উল্লেখ করার সাথে সাথে এ কথাও বলেছেন যে, আমার পরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। এরূপ ব্যাখ্যা তিনি এ জন্যেই দিয়েছিলেন, যাতে করে কাদিয়ানীদের মত গোমরাহ দলসমূহ খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার কোন সুযোগই না পায়। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আধ্যাত্মিক পূর্ণতা প্রমাণের জন্যে নতুন নবীর আগমনের দাবিও ভিত্তিহীন। বরং নতুন নবী না আসলে তাঁর আধ্যাত্মিক পূর্ণতা আরো বেশি প্রকাশ পায়।

অনেক নব্য শিক্ষিত লোক এমন রয়েছে, যাদের দ্বীনি জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত। ফলে তারা কাদিয়ানী ও আহমদীদেরকে কাফির আখ্যায়িত করাটাকে উলামায়ে কিরামের সংকীর্ণতা বলে মনে করে। এটা তাদের চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। আহমদী জামা'আত বা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমানদের মতভেদ রয়েছে ঈমান ও আকীদার ব্যাপারে। কারণ কাদিয়ানী মতবিরোধিতাকে কখনো হানাফী, শাফেঈ ও মালিকীদের মতো পারস্পরিক[ফিকহী মাসাইল

সম্পর্কিত] মতবিরোধিতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে না। কারণ, কাদিয়ানীরা নিঃসন্দেহে কাফির। এদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। এরা সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। মুসলমানদের ঈমানের হিফাযত উলামায়ে কিরামের বিশেষ দায়িত্ব। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন এবং পরকালের জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যিম্মাদারী আদায় করেছেন। সুতরাং তাদের এ যিম্মাদারী আদায়কে কিভাবে সংকীর্ণতা বলা যেতে পারে? বস্তুত কাদিয়ানী ভ্রান্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে সর্তক করা আলিমগণের দ্বীনি দায়িত্ব।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-১৫:** অনেক শি‘আ সম্প্রদায় বলে থাকে যে, তাদের ইমামগণ মাসুম ও নিষ্পাপ। তারা গায়েব জানেন এবং তারা কুরআনের যে কোন হালাল বস্তুকে যখন-তখন হারাম ঘোষণা করতে পারেন। অনুরূপভাবে যখন ইচ্ছা যে কোন হারাম বস্তুকে হালাল ঘোষণা করার অধিকার রাখেন। তারা আল্লাহর এত বেশি প্রিয় যে কোন নবী রাসূল-বা ফেরেশতা পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী স্থানেও পৌঁছতে পারে না।

শি‘আদের এ সকল আক্বীদাও শরী‘আতবিরোধী ও কুফর। [সূত্র : সূরা আনআম, আয়াত ৫৯, সূরা ইউনুস, আয়াত-১৫, মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা২০৪।] এটা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ নবী হওয়ার আকীদার পরিপন্থী হওয়ায় তা স্পষ্ট কুফরী। কারণ তাদের ইমামদের জন্য যে, অবাস্তব গুণাবলীর দাবি করা হয়েছে, তাতে তাদের ইমামগণকে নবী-রাসূল আ.দের  চেয়েও উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে এই বলে যে, নবীগণও এ সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। আখিরী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে যদি নবীদের চেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি আবির্ভূত হতে পারে, তাহলে নতুন নবী আসতে বাধা কোথায়? আসল কথা হলো নবুওয়াতের দরজা যখন বন্ধ হয়ে গেছে, তখন বাতিলপন্থীদের মাথা গরম হয়ে গেছে। আর নবুওয়াতের সেই বন্ধ দরজা খোলার জন্যে মির্জা  গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যিল্লী নবী বা ছায়া নবীর নামে, আর শি‘আ সম্প্রদায়ের লোকেরা ইমামতের নামে পুনরায় তা খুলতে ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে। মুসলমানদের এদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকতে হবে।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-১৬:** শি‘আদের অনেক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইনতিকালের পর হযরত আলী রাযি., হযরত হাসান রাযি., হযরত হুসাইন রাযি. ও হযরত আম্মার রাযি. ব্যতীত সকল সাহাবায়ে কিরাম মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন।

তাদের এই আক্বীদা কুরআনে কারীমের সূরা তাওবার ১০০ নং আয়াত “মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা অগ্রবর্তী -প্রবীণ এবং যারা উত্তমরূপে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের  প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

আল্লাহপাক তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই বড় সফলতা এবং সূরা ফাতহ’র ২৯ নং আয়াত ‘মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবীগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের প্রতি মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু-সিজদায় দেখবেন। তাদরে মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন’ ইত্যাদি বিভিন্ন আয়াত ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী হওয়ার কারণে এটা কুফরী আক্বীদা।

যে সকল লোক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন, তাঁদের কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বিভিন্ন হাদীসে সমগ্র মানুষের জন্যে আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি খুলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতের সত্যতা ও হাক্কানিয়াত সম্পর্কে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে বিরূপ বিশ্বাস সুস্পষ্ট কুফরী। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-১৭:** শি‘আদের এক ধর্মীয় নেতা লিখেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এবং হযরত উমর রাযি. শুধুমাত্র নেতৃত্ব ও দুনিয়ার লোভে বহু বছর যাবৎ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছিলেন। অন্যথায় ইসলাম ও কুরআনের সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না। তাদের নেতৃত্বের লোভের বর্ণনা দিতে গিয়ে উক্ত শি‘আ নেতা আরো লিখেছেন যে, ‘ক্ষমতা দখলের জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো দল সৃষ্টি করতে হলেও তারা পিছপা হতো না। এমনকি যদি কুরআনের কোন আয়াতে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে হযরত আলী রাযি. এর খিলাফতের কথা ঘোষণা করতেন, তাহলে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে হাদীস তৈরী করে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরাত দিয়ে আলী রাযি. এর খিলাফত সংক্রান্ত আয়াত রহিত হওয়ার কথা ঘোষণা করতেন।’ (নাউযুবিল্লাহ)

হযরত আবু বকর ও উমর রাযি. দের সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা কুফরী আক্বীদা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন। [সূত্র: মিশকাত শরীফ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৬০।] এমনকি মিরাজে তিনি হযরত উমর ফারুক রাযি. এর জান্নাত পরিদর্শন করেছেন। [সূত্র: বুখারী শরীফ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫২০।] তাছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আশ্চর্যজনক ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন, এসব বিষয়ের উপর আমি

ঈমান রাখি এবং আবু বকর ও উমরও ঈমান রাখে। অথচ সেই মজলিসে তাঁদের দু'জনের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। [সূত্র: বুখারী শরীফ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১৭।]

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তাঁদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটুকু আস্থা রাখতেন। তারপরও যদি বলা হয় যে, ইসলাম ও কুরআনের সাথে তাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না। তাহলে এটা কত বড় ডাহা মিথ্যা অপপ্রচার-তা অতি সহজেই অনুমেয়।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-১৮:** জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ লিখেছেন, নবীগণের জন্য মাসুম বা নিষ্পাপ হওয়া জরুরী নয়, বরং তাঁদের নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে গুনাহ থেকে হিফাযত করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হেফাযত তুলে নিলে, তাদের থেকেও সাধারণ মানুষের মতো গুনাহের কাজ হতে পারে। আর বস্তুত আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবী থেকে সাময়িকভাবে হেফাযত ব্যবস্থা তুলে নিয়ে দু'একটি গুনাহ সংঘটিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। যাতে মানুষ নবীদেরকে খোদা মনে না করে। সেই চিন্তাবিদ এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত ব্যাখ্যার সাথে কোন কোন নবী থেকে কি কি গুনাহ প্রকাশ পেয়েছে, তারও একটা ফিরিস্তি পেশ করেছেন। [সূত্র: তাফহীমাত-২, পৃষ্ঠা : ৫৭, ষষ্ঠ সংস্করণ।]

উল্লেখিত আক্বীদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এটা কুফরী আক্বীদা। কুরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াতে নবী-রাসূলগণের প্রতি শর্তহীন আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১, সূরা আহযাব, আয়াত ২১ ।]

এসব আয়াতের দাবী অনুযায়ী সকল নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসুম ও নিষ্পাপ এবং তাদের থেকে কোনরূপ গুনাহ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। এটাই সহীহ আক্বীদা। প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, যদি প্রত্যেক নবী-রাসূল আ. থেকে মাঝে মাঝে আল্লাহ তা'আলা হেফাযত ব্যবস্থা উঠিয়ে নেন, তাহলে সেটা উম্মত কীভাবে বুঝতে পারবে? তারা তো আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী নবী-রাসূল আ. দের সব কথা ও কাজ নিঃসন্দেহ গ্রহণ করবে। সুতরাং চিন্তাবিদ সাহেবের উক্ত কথা মানলে নবী রাসূলগণের আ. সমগ্র জীবনের তা'লীম তারবিয়্যত সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। তাদের প্রত্যেক কথা ও কাজের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ কথা বা কাজের সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর হেফাযত ব্যবস্থা জারি রেখেছিলেন, না রাখেননি? যদি জারি না রেখে থাকেন, তাহলে তাঁর এ কথা তো সহীহ নাও হতে পারে। [নাউযুবিল্লাহ] কিরূপ জঘন্য কথা! নবী-রাসূল আ. গণের ব্যাপারে উম্মত যদি এ ধরণের সন্দেহের সম্মুখীন হয়, তাহলে তাদের দ্বীন ও ঈমান কীভাবে কায়িম থাকবে? আরো লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবী-রাসূল আ. থেকে হেফাযত

ব্যবস্থা উঠিয়ে নিয়ে দু'একটি গুনাহের সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে যে, তারা খোদা নন'-এ কথার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন হয়, নবী-রাসূল আ. গণ খোদা নন-এ কথা বিশ্বাস করা জরুরী। তবে তা বোঝানোর জন্যে তাদেরকে পাপী সাব্যস্ত করার কি কোন প্রয়োজন আছে? নবী-রাসূলগণের আ. পানাহারের প্রয়োজন হয়, রোগ-শোক হয়, স্ত্রী-পুত্র-ঘর-সংসারের প্রয়োজন হয়, হাট-বাজার, আরাম-বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে, এ ধরণের আরো শত শত মানবীয় গুণাবলী কি এ কথা বোঝাতে সক্ষম নয় যে, তারা মানুষ ছিলেন, খোদা ছিলেন না? বা অন্য কোন মাখলুক ছিলেন না । নবীগণের শানে উল্লেখিত ধরণের অপবাদ নিঃসন্দেহে কুফরী।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-১৯ :** জনৈক চিন্তাবিদ খিলাফত ধ্বংসের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ইসলামী খিলাফত ধ্বংসের জন্যে হযরত উসমান রাযি. কে প্রথম আসামী বানিয়েছেন। তার দৃষ্টিতে দ্বিতীয় আসামী হচ্ছেন হযরত মু'আবিয়া রাযি.।[নাউযুবিল্লাহ]

তার বর্ণিত এসব তথ্য সম্পূর্ণরূপে শি'আ ও ইহুদীদের দ্বারা লিখিত ইসলামের নামে বিকৃত ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল। ইসলামের কোন সহীহ ইতিহাস দ্বারা এসব বানোয়াট তথ্য প্রমাণিত হয়। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে ইসলামের নামে যে ইতিহাস পড়ানো হয়, তারও অবস্থা একই রকম। ইসলামের নামে এসব ইতিহাস শি'আ ও ইহুদী কর্তৃক প্রথমত আরবী ভাষায় লেখা হয়, তারপরে আরবী হতে ইংরেজিতে অনুদিত হয়। এরপর আমাদের কতিপয় পণ্ডিত উক্ত ইংরেজি গ্রন্থসমূহ থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এসব ইতিহাস পড়ে ইসলামের সঠিক ঘটনা জানার কোন উপায় নেই। বরং এগুলো পড়ে অনেকেই বিভ্রান্তিবশত সাহাবাবিদ্বেষী হয়ে ঈমান হারাচ্ছে। আবার কেউবা সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে। তারা হযরত উসমান রাযি. সম্পর্কে এরূপ কু-ধারণা পোষণ করে যে, তিনি স্বজনপ্রীতি করে নিজের লোকদেরকে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। তেমনিভাবে হযরত মু'আবিয়া রাযি. রাজতন্ত্রের বুনিয়াদ কায়িম করেছেন ইত্যাদি। [নাউযুবিল্লাহ]

তাদের এসব ধারণা একবারেই অমূলক ও ভিত্তিহীন। সহীহ ইসলামী ইতিহাস গ্রন্থ যেমন, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আত তারীখুল কামিল ইত্যাদি যারা পড়েছেন, তাদের নিকট আমাদের দাবির সত্যতা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই খবরদার! ইসলামের নামে গলদ ইতিহাস পড়ে সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে ঈমান হারাবেন না। সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা রাখা ও নিফাক এবং একজন মু'মিন-মুসলমানের ঈমানের জন্যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-২০:** কতেক মূর্খ লোক বলে থাকে যে, হযরত নূহ আ. এর তুলনায় আমাদের নবী বেশি দয়াশীল ছিলেন। হযরত মূসা আ. বেশি রাগী ছিলেন। আর আমাদের নবী অত্যন্ত নরম মেযাজের ছিলেন। হযরত ঈসা আ. রাজনীতি জানতেন না, আমাদের নবী রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন ইত্যাদি।

আশ্চর্যের কথা এই যে, অনেক বক্তাও ওয়াযের মধ্যে এরূপ কথা বলে থাকেন। অথচ এর থেকে বিরত থাকা খুবই জরুরী। কুরআন ও হাদীসে এর থেকে পরহেজ থাকার জোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দুই নবীর মধ্যে তুলনা করে একজনকে ছোট করে দেখানো বা একজনকে কোন ব্যাপারে অসম্পূর্ণ বা নাকিস গণ্য করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কুফরী কাজ। পয়গাম্বরগণ সকলেই সর্বদিক দিয়ে কামিল ও সর্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন। [সূত্র : সূরা বাকারাহ, আয়াত ২৮৫, বুখারী শরীফ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৮৪।]

অবশ্য কামিল হওয়ার ব্যাপারে কারো মর্তবা বেশি আর কারো মর্তবা ছিল কম। তাই সকল নবী সম্পর্কে সু-ধারণা রাখতে হবে এবং তাদের সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। একজনের তুলনায় অন্যজনকে ছোট, হেয় বা নাকিস গণ্য করা যাবে না।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-২১ :** নব্য শিক্ষিতদের অনেকে নবী-রাসূলগণের আ. মু'জিয়া বা অলৌকিক ঘটনাসমূহ তাদের যুক্তি ও বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ধরা না পড়ায় অস্বীকার করে বসে।

কুরআন-হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা দ্বারা নবী-রাসূলগণের আ. মু'জিযা সু-প্রমাণিত। সুতরাং, বিনা বাক্য ব্যয়ে এগুলো মেনে নেয়া এবং এগুলো বিশ্বাস করা ঈমানের জন্যে জরুরী। কেউ এগুলো অবিশ্বাস করলে, তার ঈমান থাকবে না। যেমন, হযরত ইবরাহীম আ. এর জন্যে নমরুদের আগুণ আল্লাহর আদেশে শান্তিদায়ক ঠাণ্ডায় পরিণত হয়েছিল। [সূরা আমবিয়া আয়াত ৬৯।] হযরত মূসা আ. ও তাঁর কওমের জন্যে লোহিত সাগরের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করে দেয়া হয়েছিল। [সূরা আল-ইমরান : ৪৯।]

হযরত ঈসা (আঃ) قم باذن الله- বললে মুর্দা জীবিত হয়ে যেত। [সূরা ত্বাহা : ৭৭] আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, ইত্যাদি। [সূরা কামার : ১]

বস্তুত কোন বিষয় যুক্তি বা বিজ্ঞান দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হওয়ার পর তা মানার নাম ঈমান নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাকে সরল অন্তঃকরণে বিনা যুক্তি-তর্কে মানার নামই হচ্ছে ঈমান। যেমন, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর-নাশর, মীযান-

পুলসিরাত ইত্যাদি কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়গুলো সাইন্স আর যুক্তি দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করে, তাহলে কখনো সে এগুলো বুঝতে পারবে না।

কারণ যুক্তি ও সাইন্স পঞ্চইন্দ্রিয়ের অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল। আর আখিরাত ও পরকালের বস্তুসমূহ পঞ্চইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সীমার বাইরের জিনিস। সুতরাং, যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝাতে চাইলে তার জন্য ঈমান আনা দুস্কর। এ জন্যে সূরা বাকারার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন, মুত্তাকী হওয়ার জন্য প্রথম গুণ হচ্ছে অদৃশ্য বস্তুসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।[সূরা বাকারাহ, আয়াত-৩।]

মূলত শরী'আতের বিধানসমূহ হচ্ছে বাদশাহ, আর যুক্তি-বিজ্ঞান হচ্ছে তার দাসীতুল্য। বাদশাহের নির্দেশ পাওয়ার পর তা পালন করার জন্যে তার বাদীর নিকট জিজ্ঞেস করা যেমন বেওকুফী, তেমনিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন নির্দেশ দেয়ার পরে তা গ্রহণ করার জন্য যুক্তি বা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করাও চরম মূর্খতা ও জাহিলিয়্যাত। স্মর্তব্য, যে হযরত আদম আ. কে সিজদা না করে যুক্তির পথে সর্বপ্রথম পা বাড়িয়েছিল ইবলিস। এরই পরিণতিতে সে আল্লাহর দরবার থেকে বহিষ্কৃত হয়ে চিরজীবনের জন্যে আল্লাহর দুশমন আখ্যায়িত হয়েছে।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-২২:** কোন কোন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাত্রের মধ্যে যে মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মুক্বাদ্দাস, অতঃপর সেখান থেকে সাত আসমান ও আরশ ভ্রমণ করেছেন, তারপর ফজরের পূর্বে আবার ফিরে এসেছেন- এ ঘটনাকে তারা বিশ্বাস করে না। পশ্চিমা ও ইউরোপওয়ালাদের যুক্তি ও সাইন্স-এর প্রভাবে তারা মিরাজকে কাল্পনিক কাহিনী বলে আখ্যায়িত করে।

তাদের এই আক্বীদা যেহেতু সরাসরি কুরআনে কারীমের সূরা বনী ইসরাঈল ১নং আয়াত "পবিত্র ও মহিমাময় সত্ত্বা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলা মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন, যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও সর্বদ্রষ্টা'-এর পরিপন্থী। সুতরাং, তা স্পষ্ট কুফর। মধ্যাকর্ষণ শক্তি ও সময়ের স্বল্পতা ইত্যাদি যত প্রশ্নই করা হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলার মহাকুদরতের সামনে তা নিতান্তই খোড়া ও অবাস্তব। যে খোদা আসমান, জমীন, সময় মধ্যাকর্ষণ শক্তিসহ এত বড় সৌরজগৎ একটা 'কুন' শব্দের দ্বারা সৃষ্টি করলেন, সেই খোদার জন্যে স্বীয় হাবীবকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সপ্ত আসমান ও আরশের সফর করানো কোন ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানীদের তৈরী বিভিন্ন খেয়াযান যদি মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ভেদ করে তার

উপরে যেতে পারে, তাহলে আল্লাহ তা‘আলার তৈরী যান ‘বুরাক-রফরফ’ সেটাকে ভেদ করতে পারবে না কেন? এ সম্পর্কে অবান্তর প্রশ্ন তোলা আহমকির-ই পরিচায়ক।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-২৩:** অধিকাংশ বিদ‘আতী লোকেরা বিশ্বাস করে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযির-নাযির এবং তিনি গাইব জানতেন। তেমনিভাবে অনেকে তাদের ভন্ডপীর সম্পর্কেও এরূপ আক্বীদা পোষণ করে যে, তাদের খাজাবাবা গাইব জানে এবং অনেক দূর-দূরান্ত থেকে বিপদগ্রস্ত মুরীদদের বিপদের কথা নিজে জেনে তাকে বিপদমুক্ত করতে পারে।

লোকদের এ ধারণাও স্পষ্ট কুফর ও শিরক। কারণ সদা সর্বত্র হাযির-নাযির ও আলিমূল গাইব হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। কোন নবী-রাসূল, পীর বুজুর্গ সদা সর্বত্র হাযির-নাযির বা আলিমুল গাইব হতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন: “তাঁর কাছেই গায়েবের বা অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।” [সূত্র: সূরা আনআম, আয়াত ৫৯।]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, “হে নবী! আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের বা ক্ষতি সাধনের মালিক নই; তবে আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়। আর আমি যদি গাইবের কথা জানতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করতে পারতাম। তখন কখনো আমার কোন অমঙ্গল হতে পারত না। আমি তো ঈমানদারদের জন্যে শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা।” [সূত্র: সূরা আরাফ, আয়াত ১৮৮]

এ ধরনের অনেকগুলো আয়াত কুরআনুল কারীমে বিদ্যমান আছে। তেমনিভাবে অনেক সহীহ হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন, এক হাদীসে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আমি তোমাদের পূর্বে হাউজে কাউসারে অবস্থান করবো। আমার নিকট যারা পৌঁছবে, তারা হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করবে এবং যারা সেখান থেকে পানি পান করবে, বেহেশতে পৌঁছার পূর্বে আর কখনো তারা পিপাসিত হবে না। তখন কিছু লোক আমার নিকট পৌঁছবে। কিন্তু তাদেরকে তৎক্ষণাত বাধা দেয়া হবে। তখন আমি বলব, এ লোকগুলো তো আমার উম্মত! আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে, আপনার পরে এরা দ্বীনের মধ্যে যে কত প্রকার নতুন জিনিস দাখিল করেছে, তা আপনি জানেন না। তখন আমি বলব, ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে আমার পরে দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছে। [সূত্র : বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৪৭, মুসলিম শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৯]

এছাড়াও শাফা‘আতে কুবরার ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণসহ যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ সকল

নবীগণের আ. থেকে নিরাশ হয়ে হাশরের ময়দানে হিসেব শুরু হওয়ার সুপারিশ নিয়ে যখন আমার নিকট পোঁছাবে, তখন আমি সিজদায় পড়ে এমন শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ছানা-সিফাত বর্ণনা করবো, যা আল্লাহ তা'আলা ঐ সময় আমাকে শিক্ষা দিবেন এবং তা এমন প্রশংসাবাণী হবে যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্বে তা কাউকে শিক্ষা দেন নি। [সূত্র: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৮৫, বুখারী ও মুসলিম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা - ১০৯।]

উভয় হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ থেকে গাইব জানতেন না। হাদীসে এ বিষয়ে এরূপ শত শত প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। হযরত আয়েশা রাযি. এর ওপর যখন মুনাফিকরা যিনার অপবাদ দিয়েছিল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ এক মাস অস্থির ছিলেন। তারপর 'সূরা নূর' এর প্রথমাংশ নাযিল হলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন। [সূত্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৯৬।]

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে যখন খাইবার বিজিত হলো, তখন ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত দিল এবং বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খেতে দিল। তখন জিবরাঈল (আ কে পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে সতর্ক করার পর তিনি মুখ থেকে গোশত ফেলে দিলেন।[সূত্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬১০।]

**গাইব জানার অর্থ:** কারোর জানিয়ে দেয়া ব্যতীত নিজে নিজে জানা এবং সর্বপ্রকার গাইবের সংবাদ জানা। এ ধরণের জ্ঞান কোন মাখলুককেই দেয়া হয়নি। তবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব গাইবের খবর জানতেন, সেগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এগুলোর একটিও তিনি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা জানতেন না। আর এটা তার নবুওয়াত বা মর্যাদার পরিপন্থী নয়। কারণ, নবী হওয়ার জন্যে গায়েব-জান্তা হওয়ার কোন শর্ত নেই। নবীগণ গায়েব-জান্তা হলে অহীর কী প্রয়োজন ছিল?

**দ্বিতীয়ত:** তিনি সকল প্রকার গাইব জানতেন না। যেমন, ইতিপূর্বে এতদসংক্রান্ত অনেক ঘটনা ও হাদীস পেশ করা হয়েছে। সুতরাং, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত-জাহান্নাম, কবর-হাশর, আরশ-কুরসী ইত্যাদি সম্পর্কে যত বর্ণনা প্রদান করেছেন, সেগুলোর ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে দান করা হয়েছিল। অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আলিমুল গাইব' বলে বিশ্বাস করে আল্লাহর বিশেষ গুণাবলির মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শরীক করে নিজের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয়।

সাহাবায়ে কিরাম তৎকালীন সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তৎকালীন সময় নানা ধরণের প্রশ্ন করতেন, সেগুলোর জবাবের জন্যে তিনি অহী আগমনের অপেক্ষায় থাকতেন। কুরআনে এ ধরণের অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। সুতরাং, যদি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলিমুল গাইব হতেন, তাহলে জবাবের জন্যে অহী নাযিলের অপেক্ষা করার কী প্রয়োজন ছিল? তাছাড়া কুরআন নাযিল হওয়ারই বা কী প্রয়োজন ছিল? আর নবী রাসূলগণ আ. যখন গাইব জানতেন না, তখন কোন পীর কিংবা খাজাবাবা গাইব জানেন-এরূপ ধারণা অন্তরে পোষণ করা যে কত বড় মূর্খতা, তা বলাই বাহুল্য।

অনেক মূর্খ লোক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাযির-নাযির বলে বিশ্বাস করে। তারা মীলাদ মাহফিলের মধ্যে চেয়ার খালি রেখে দেয় এবং হঠাৎ একসময় সকলে সম্মিলিতভাবে দাঁড়িয়ে যায়। এগুলো সব মনগড়া কাজ। এর সপক্ষে শরী‘আতে কোন দলিল নেই। হুযূর সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম-এর তিরোধানের পর সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কত দ্বীনি মজলিস করেছেন। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং আমাদের চেয়ে অনেক বেশি মুহাব্বত রাখতেন। কিন্তু তাঁরা কখনো তাঁদের মজলিসে এরূপ কিয়াম করেন নি। এটা একটা আজব ব্যাপার যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সালাম এর প্রকৃত মুহাব্বতকারী সাহাবায়ে কিরাম রাযি. দুরূদ পড়ার সময় কখনো কিয়াম না করলেও এসব বিদ‘আতীরা দুরূদ পড়তে পড়তে একসময় দাঁড়িয়ে যায়। এখন প্রশ্ন জাগে, তারা যখন দাঁড়ায়, তখন কিভাবে বুঝতে পারে যে, এ মুহূর্তে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসছেন-যদ্দরুন এখন দাঁড়ানো প্রয়োজন? এবং যখন একটু পরে তারা বসে পড়ে, তখন কী করে তারা বুঝতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন চলে গেছেন? সুতরাং, এখন বসা দরকার। হাস্যকর ব্যাপার যে, তারা যখন বলে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বত্র হাযির-নাযির, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রস্থান অনুমান করে বসে যায় কিভাবে? যিনি সদা সর্বত্র হাযির-নাযির, আবার প্রস্থান হয় কি করে? কেননা, তিনি তো সদা হাজিরই থাকবেন। দেখা যাচ্ছে-তাদের কথা ও কাজ পরস্পর বিরোধী। বলা বাহুল্য, মিলাদ মাহফিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন-প্রস্থানের এ ধরণের আক্বীদা পোষণ করা শিরক-মহাপাপ।

শরী‘আতের দৃষ্টিতে, দাঁড়িয়ে বা বসে সব অবস্থায়ই দুরূদ শরীফ পড়া যায়। তবে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে নামাযের মধ্যে বসা অবস্থায় দুরূদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যে কারণে নামাযের আখিরী বৈঠকে তাশাহুদের পর বসাবস্থায়ই দুরূদ শরীফ (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা......) পড়া হয়ে থাকে। সুতরাং বসে দুরূদ শরীফ পড়া যে উত্তম, তাতে

সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। আর সম্মিলিতভাবে একই সুরে অশুদ্ধ উচ্চারণে দরূদ পড়ার পদ্ধতিও শরী'আতে প্রমাণিত নয় এবং শব্দ ও অর্থগত ভুলসহ 'ইয়া নবী' ওয়ালা দরূদ-সালাম পড়াও ঠিক নয়। হাদীসের কিতাবে সহীহ দরূদের কোন অভাব আছে কি? তাছাড়া মীলাদের নামে একটা মাহফিলে দ্বীনের কোন আলোচনা নেই, সুন্নাতের কোন বর্ণনা নেই, অথচ আরবী ফারসী বাংলা ও উর্দু ভাষার কিছু কবিতা পাঠ করা হলো, কয়েকবার ভুল-অশুদ্ধ উচ্চারণে ও গলদ তরিকায় কয়েকবার দুরূদ-সালাম পড়া হলো, আর তাকে মহা ইবাদত ও পুণ্যের কাজ মনে করা হলো, ব্যস। বস্তুত এটা দ্বীনের নামে আত্মপ্রবঞ্চনা এবং কিছু অর্থলোভী মৌলভীদের রোজগারের হাতিয়ার মাত্র। দ্বীনের সাথে এগুলোর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। আর আখিরাতে এসব আমলের বিনিময়ে কোন সওয়াবের আশা করাও অবান্তর। বরং ভুয়া ইশকে রাসূলের নামে এ সকল গর্হিত বিদ'আতী কর্মকাণ্ডের কারণে পরকালে তারা ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সুতরাং এ জাতীয় দ্বীনের নামে ধোঁকামূলক যাবতীয় কার্যকলাপ হতে সকল মুসলমানের বেঁচে থাকা কর্তব্য।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-২৪:** অনেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে এ বিশ্বাস পোষণ করে থাকে যে, তিনি নূরের তৈরী, তিনি শুধুমাত্র মানবাকৃত ধারণকারী বাস্তবিক পক্ষে তিনি সাধারণ মানুষের মত কোন মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন নূরের তৈরী অনেক আবার এও বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহর নূরে রাসূল সৃষ্টি অর্থাৎ আল্লাহর জাতি বা সত্তাগত নূরে রাসূল সৃষ্টি, তিনি আল্লাহর মূল সত্ত্বার একটি অংশ (নাউযুবিল্লাহ)।

উল্লেখিত উভয় আক্বীদাই সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী বিধ্বংসী আক্বীদা। কারণ প্রথমত আল্লাহ তা'আলা যে নূরের তৈরী এর কোন প্রমাণ নেই। আল্লাহ তা'আলার সাথে পৃথিবীর কোন বস্তুর তুলনা নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيٌّ- কোন জিনিস তার তুলনা নেই।

তাই আল্লাহ তা'আলা নূর বা নূরের তৈরী বলা কোন অবস্থাতেই ঠিক হবে না। সম্পূর্ণ কুফর এবং শিরক হবে। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলাকে নূরের তৈরী মানলে তাঁকে মাখলুক তথা সৃষ্টি বস্তু মানতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ) কেননা, নূর মাখলুক আর নূরের দ্বারা যে জিনিস তৈরী সে জিনিসও মাখলুক হবে। আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুক বলে বিশ্বাস করলে তো সাথে সাথে ঈমান চলে যাবে। আল্লাহ তা'আলাতো সবকিছুর খালিক (সৃষ্টিকারী)। তিনি কি করে মাখলুক হতে পারেন?

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নূরের তৈরী বলাও মারাত্মক ভুল, ভ্রান্ত আক্বীদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য সকল মানুষের মতই মাটির তৈরী একজন মানুষ ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন সকল যুগের

সবচেয়ে সেরা মানুষ। মানব জাতির গৌরব হিদায়তের নূর বা আলো। রিসালাতের নূর, ঈমানের নূর। বা তাঁর মাটির শরীরে নূরে সংমিশ্রণ ছিল, এটা বাস্তব বৈকি। তাই বলে তিনি নূরে তৈরী বা মানুষ ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন জাতি ছিলেন না। তিনি ছিলেন মানব জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ মানব জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল-তারা পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভে জন্ম লাভ করে। মাতৃদুগ্ধ পান করে, ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় হতে থাকে, পানাহার নিদ্রা-প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদির মত স্বাভাবিক ক্রিয়া কর্মের পাশাপাশি তারা জৈবিক চাহিদার কারণে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এতে সন্তান-সন্তাদির প্রজন্ম হয়। তারা সুখে যেমন হাসে-দুঃখেও তেমন কাঁদে, রোগ, শোক ও দুঃখে যেমন তারা কাতর হয় তেমনি যাদু ও বিষক্রিয়ায় তারা চরম কষ্ট পায়। এমনকি মৃত্যুর দুয়ারে পর্যন্ত ঢেলে যায়। আর এ সমস্ত মানবীয় বৈশিষ্ট্য কেবল মাটির তৈরী মানুষের বেলায়ই প্রযোজ্য। এখন এমন কেউ কি আছেন যিনি প্রমাণ করতে পারেন যে মানবী এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যর কোন একটি থেকেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্ত ছিলেন, কস্মিনকালেও কেউ পারবে না। কারণ, তিনি তো মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ

হে নবী! আপনি বলে দিন! আমি তোমাদের মতই মানবজাতের একজন মানুষ। তবে আমার নিকট ওহী আসে (কেবল এক্ষেত্রে আমি তোমাদের ব্যতিক্রম) [সূত্র : সূরা কাহাফ, ১১০]

অন্যত্র ইরশাদ করেন- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ

আমি মানুষকে মাটির সারাংশ (খাদ্য সার) থেকে সৃষ্টি করেছি।[সূত্র:সূরা মু‘মিনূন,১২]

সুতরাং, উক্ত আয়াত সমূহ থেকে প্রমাণ হল রাসূল অন্যান্য মানুষের মত মাটির তৈরী। অতএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মানুষ বলে বিশ্বাস করা জরুরী। তা না হলে প্রথম আয়াত অস্বীকার করে কাফির হয়ে যাবে। আর যখন মানুষ বলা হল তাহলে দ্বিতীয় আয়াত হিসাবে তার মাটির তৈরী হওয়া জরুরী ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তা না হলে আয়াত অস্বীকার করে কাফির হতে হবে।

তাছাড়া মানুষ হল আশরাফুল মাখলুকাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি মানুষই না বলা হয়, তাহলে তিনি তো আশরাফুল মাখলুকাত থেকেই বাহির হয়ে যাবেন। যা কিছুতেই হতে পারে না। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে স্বীকার করা হয় তাহলে তাকে অবশ্যই মাটির তৈরী মানুষ হিসাবেই স্বীকার করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَرًا رَسُولاً

বলুন আমার পবিত্র মহান পালন কর্তা, আমি একজন মানুষ রাসূল। [সূরা বনী ইসরাইল ৯৩-৯৫] [এছাড়া সূরা আরাফ ৬৯, সূরা হুদ ২৭, সূরা মুমিনূন ৩৩, সূরা শুয়ারা ২৩, হা-মীম সিজদা ৬, সূরা আম্বিয়া ৩৪]

উল্লেখিত আয়াতেও রাসূলে সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ তথা মাটির তৈরী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ঘোষণা করেন : "اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ" অর্থাৎ: " আমি তো একজন মানুষ।" [সূত্র:বুখারী ১,৩৩২/মুসলিম ২:৭৪]

অন্যত্র ইরশাদ : " اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌمِّثْلُكُمْ " অর্থাৎ,"আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ।" [সূত্র: বুখারী ১:৫৮]

এ সব উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির তৈরী একজন মানুষ। নূরের তৈরী নন। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা। যদি কেউ ইহার ব্যতিক্রম বিশ্বাস করে তাহলে সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বেরিয়ে যাবে।

## কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা

**ভ্রান্ত আক্বীদা-২৫:** অনেক মূর্খ লোক বিভিন্ন ভণ্ড পীর ও খাজা বাবাদের প্রতি এরূপ বিশ্বাস রাখে যে, তারা কবরে, হাশরে, পুলসিরাতে যত রকম সমস্যা আছে, সব সমস্যা থেকে মুরীদদেরকে পার করে নিয়ে যাবেন এবং নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করে তাদেরকে বেহেশতে নিবেন। তাদের বাবারাও বলে থাকেন যে, আমার কোন মুরীদকে পুলসিরাতে রেখে আমি বেহেশতে প্রবেশ করবো না।

এসব আক্বীদা পোষণ করা এবং এরূপ দাবী কুফরী কাজ। কোন মানুষ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না, সে জান্নাতী। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, খোদার কসম! আমি জানি না যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার কী ফায়সালা? অথচ আমি আল্লাহর রাসূল। [সূত্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা -১৬৬।]

এ কারণে কেউ নিজের সম্পর্কে জান্নাতী হওয়ার দাবী করতে পারে না। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আশা পোষণ করা যায়। কাজেই আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা উচিত এবং বেহেশতের আশা রাখা উচিত।

তেমনিভাবে অন্যের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা তো শরী'আতের নির্দেশ, কিন্তু এমন বিশ্বাস রাখা বা দাবি করা নিষেধ যে, অমুক ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে আল্লাহর ওলী বা জান্নাতী। তবে যাদের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে-হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, তাদেরকে জান্নাতী হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, কেউ যদি সত্যিকার অর্থে বুযুর্গ বা আল্লাহর ওলী হয়ে যান, তাহলে তাদেরকে হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা সুপারিশ করার অনুমতি দিলে, তারা লোকদের জন্যে সুপারিশ করতে পারবেন। তবে কেউ নিজের পক্ষে এরূপ দুঃসাহস দেখাতে পারবে না। কেননা, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে আল্লাহ তা'আলা সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন, কেবলমাত্র তারাই সুপারিশ করতে পারবেন। আর সেটা এমন হবে, যেমন দুনিয়াতে একজন সাধারণ মানুষ বাদশাহের দরবারে সুপারিশ করেন। বাদশাহ এ সুপারিশ কবুল করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। সুতরাং কেউ তার মুরীদকে সুপারিশ করে নিশ্চিতভাবে বেহেশতে নিয়েই যাবে-এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ শরী'আতবিরোধী।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-২৬:** অনেকে নিজের বুযুর্গী জাহির করার জন্যে দাবি করে থাকে যে, তারা দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখে থাকে। আবার অনেক প্রতারক ভণ্ড লোকদের জিজ্ঞেস করে যে, তুমি ৭০/৮০ বছর যাবৎ আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী করছ, কতবার আল্লাহকে দেখেছ? উত্তরে সেই ব্যক্তি যদি বলে, আমি একবারও তো আল্লাহকে দেখতে পাইনি, তখন বলা হয় যে, তাহলে তো তোমার ইবাদত-বন্দেগী কিছুই হলো না। তুমি যদি সঠিকভাবে নামায পড়তে, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হতে।

লোকদের এরূপ আক্বীদাও কুফরী। কতিপয় ভন্ডপীর ও খাজাবাবারা লোকদের সহজে নিজের দলে ভিড়ানোর জন্যে এরূপ ফন্দি করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, "দুনিয়াতে কোন চর্মচক্ষু আল্লাহকে দেখতে পারে না।" [সূত্র: সূরা আনআম, আয়াত, ১০৪।]

হযরত মূসা আ. আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসার আবেগে বিহ্বল হয়ে যখন তাঁর দীদার প্রার্থনা করলেন, তখন জবাবে ইরশাদ হলো "হে মূসা! কস্মিনকালেও দুনিয়াতে চর্মচক্ষু দ্বারা আমাকে দেখতে পারবে না।" [সূত্র: সূরা আরাফ, আয়াত ১৪২।]

হাদীসে শরীফে এসেছে যে, "জেনে নাও। তোমরা কখনো চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারবে না। হ্যাঁ, মৃত্যুর পর মু'মিনরা হাশরের ময়দানে এবং বেহেশতের মধ্যে বেহেশতী চক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখতে পারবে। বরং জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হবে, আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভ। [সূত্র : মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা -১০০।]

মু‘মিনরা দুনিয়াতে চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখতে পারবে না-এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদা। বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর হিজাব বা পর্দা এমন নূরের, যা আমাদের কল্পনার বহির্ভূত। সে নূরকে কোন চর্মচক্ষু বরদাশতও করতে পারবে না। অথচ সেই সূর্যের দিকে চর্মচক্ষু দ্বারা তাকানোই যখন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, তাহলে আল্লাহ তা’আল্লাকে দুনিয়াতে কিভাবে দেখা সম্ভব? তবে বেহেশতের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা বিশেষ শক্তির অধিকারী করে জান্নাতীদের তৈরী করবেন। তখন তাদের মাঝে আল্লাহর দর্শন লাভের ক্ষমতা দান করা হবে। সুতরাং, তখন তারা উক্ত নেয়ামত লাভে ধন্য হতে পারবেন।

অবশ্য দুনিয়াতে স্বপ্নের মধ্যে কেউ আল্লাহকে কোন আকৃতিতে দেখতে পারে, বা খাবের মত অবস্থা যাকে ‘ইসতিগরাকী কাইফিয়াত’ বলা হয়, সে অবস্থায়ও কেউ কেউ আল্লাহকে অন্তরচক্ষু দ্বারা মুশাহাদা করতে পারে, সেটা সম্ভব। যেটা সম্ভব নয়, তা হলো জাগ্রত অবস্থায় চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখা। সুতরাং কেউ যদি এরূপ দাবি করে, তাহলে তাকে মিথ্যুক, গোমরাহ ও কুফরী আক্বীদাওয়ালা বলা হবে। তার থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব ।

**তাকদীরের ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা**

**ভ্রান্ত আক্বীদা-২৭:** অনেক মূর্খ লোক আছে, যারা ইবাদত-বন্দেগী, নামায-রোযার ধার ধারে না, সময় পেলেই তাকদীর নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দেয় এবং এমন কথা বলতে শুরু করে, যা ঈমানের জন্যে হুমকিস্বরূপ; যেমন তারা বলে-সবকিছুই যখন আল্লাহ তা‘আলা লিখে রেখেছেন, তাহলে চোরের কী দোষ? মদখোরের কী দোষ? আল্লাহ তা‘আলা যখন কে জান্নাতী কে জাহান্নামী লিখে রেখেছেন, তাহলে ইবাদত-বন্দেগী করে লাভ কী? আল্লাহ তা‘আলা শয়তানকে সৃষ্টি করলেন কেন? ইত্যাদি বিভিন্ন অমূলক প্রশ্ন তারা করে থাকে।

এ ধরণের প্রশ্ন ঈমানের জন্যে ক্ষতিকর। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা যা করেন, তার বিরুদ্ধে আপত্তি করার অধিকার কারো নেই।’ [সূত্র : সূরা আমবিয়া, আয়াত ২৩]

সুতরাং আল্লাহর বিরুদ্ধে এ ধরণের আপত্তি ও অভিযোগ করা কুফরী কাজ। মানুষের কামিয়াবী আল্লাহর হুকুম-আহকামকে সরল অন্তঃকরণে মেনে নেয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সুতরাং, কোন যুক্তি-তর্ক বা অভিযোগ উত্থাপন না করে আল্লাহর প্রতি এরূপ বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, তিনি যা বলেন, যা করেন, যে আদেশ-নিষেধ করেন, সবই সহীহ, সঠিক ও বান্দার জন্যে মঙ্গলজনক। এর মধ্যে বান্দার অনিষ্টের কিছুই নেই। তাকদীরের ব্যাপারে শরী‘আতের বিধান এই যে,

ঈমানের অঙ্গ হিসেবে মনে-প্রাণে তা মেনে নেয়া এবং এ ব্যাপারে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা বা কল্পনাপ্রসূত কোন তর্ক-বিতর্ক বা আলোচনা-পর্যালোচনা না করা কর্তব্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি আকল-বুদ্ধি দ্বারা তাকদীরের ব্যাপারে তর্ক-বাহাস করল, তাকে কিয়ামতের দিবসে এ জন্যে জবাবদিহী করতে হবে। আর যে ব্যক্তি তাকদীরের বিষয়ে কোন তর্ক-বাহাস করল না, তাকে এজন্যে কিয়ামতের দিবসে কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না।’ [সূত্র : ইবনে মাজাহ ও মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ২২।]

অপর এক হাদীসে এসেছে, একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে আসলেন। তখন কতিপয় সাহাবী রাযি. তাকদীরের বিষয়ে তর্ক করছিলেন। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীষণ রাগান্বিত হয়ে গেলেন। তাঁর চেহারা মুবারক লাল বর্ণ ধারণ করল। তিনি বলতে লাগলেন, ‘তোমাদের কি এ বিষয়ে বাহাস করতে আদেশ করা হয়েছে? না আমাকে এ বাহাস করার জন্যে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে? তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাকদীরের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তোমাদেরকে কঠোর নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা এ ব্যাপারে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না।’ [সূত্র : তিরমিযী শরীফ। খণ্ড-২ পৃষ্ঠা ৩৪।]

সুতরাং এ ধরণের আপত্তিকর কথাবার্তা কোনক্রমেই না বলা উচিত। এ ধরণের উদ্ভট প্রশ্নকারীদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আল্লাহ তা‘আলা পূর্ব হতেই সবকিছু জেনে সেভাবেই লিপিবদ্ধ করে থাকলে, তাতে আমাদের কী? আমরা তো আর সে লেখা দেখিনি বা জানিও না। তাছাড়া তিনি পূর্ব হতে লিখে রাখার দরুন আমাদের শক্তি তো লোপ পায়নি। আমাদেরকে তিনি ভালো-মন্দ বোঝার এবং সে অনুযায়ী কাজ করার শক্তি দান করেছেন এবং ভালো কাজ করার ও মন্দ কাজ না করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা অতিক্ষুদ্র মাখলুক ও তাঁর দাস। সুতরাং তিনি আমাদেরকে যে আদেশ করেছেন, তা বিনা বাক্য ব্যয়ে শিরোধার্য করে নেয়াই আমাদের দায়িত্ব। তিনি কী লিখে রেখেছেন, তা আমাদের দেখার বিষয় নয়। বরং তার হুকুম তামিল করাই আমাদের দায়িত্ব। তাঁর প্রদত্ত শক্তির অপব্যবহার করলে কিংবা তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করলে, এ নাফরমানির দরুন নিশ্চয়ই তাঁর নিকট জবাবদিহী করতে হবে এবং তাঁর প্রদত্ত শক্তির সহীহ ব্যবহার করলে, তাঁর আদেশ পালন করলে তিনি তার উত্তম প্রতিদান দিবেন।

বিস্ময়ের কথা হলো যে, তাকদীরের দোহাই দিয়ে লোকেরা আখিরাতের জন্যে নেক কাজের চেষ্টা-তদবির বন্ধ করে বসে থাকে এবং আল্লাহ তা‘আলার ফায়সালার ওপর খুবই ভরসা ও তাওয়াক্কুল রয়েছে বলে প্রকাশ করে; কিন্তু দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যে, আয়-রোজগার, উন্নতি-অগ্রগতির ব্যাপারে আল্লাহর

ওপর ভরসা করে বসে থাকতে দেখা যায় না; বরং দুনিয়ার ব্যাপারে তারা অত্যন্ত হুঁশিয়ারি, খুবই কর্মঠ। যত রকম চেষ্টা-তদবির আছে, কোন কিছুই তখন আর বাদ থাকে না। অথচ ঐ সব ব্যাপারও তো সে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায়ই আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন যে, তার রিযিক কী পরিমাণ হবে? সে চেষ্টা করুক আর নাই করুক, ঐ পরিমাণ রিযিক তার ভাগ্যে জুটবেই। [সূত্র : সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১৮]। এবং শত চেষ্টা-তদবির করেও তার থেকে একবিন্দু পরিমাণ রিযিকও সে বাড়াতে পারবে না।[সূত্র : সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩০।]

উল্লেখ্য যে, মানুষ যতই মেহনত করুক, রিযিকের ব্যাপারে তার ভাগ্যের নির্ধারণ পরিমাণ ঠিকই থাকবে। তবে কেউ ধৈর্য ধারণ করলে হালাল পন্থায় অর্জন করবে, আর কেউ অধৈর্য হয়ে জায়িয-নাজায়িযের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে হারাম পন্থায় তা উপার্জন করবে। প্রশ্ন হলো, দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় বিষয় যখন লেখা আছে, তাহলে একটার ব্যাপারে এত চেষ্টা-তদবির এবং দ্বিতীয়টার প্রতি উদাসীনতা কেন? যদিও সে আল্লাহর ওপর ভরসা দেখাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে কি তাই? আসল কথা হলো, তাকদীরের ব্যাপারে আমাদের ঈমান বড় দুর্বল। আখিরাতের ব্যাপারে বিশ্বাস বড় কমজোর এবং আগ্রহের খুবই অভাব। কারণ, অধিকাংশ লোক ঈমান হাসিল করা, তা সহীহ-শুদ্ধ করা ও পাকা-পোক্ত করার ব্যাপারে চরম উদাসীন। এটাকে তো কোন কাজই মনে করে না; এর প্রতি কোন গুরুত্বই দেয় না এবং এর জন্যে কোন মেহনতের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে না। বরং পৈতৃক সূত্রে যে মুসলমানী নাম লাভ করেছে, তাকেই মু'মিন ও মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করে। মুসলিম মিল্লাতের অধঃপতনের জন্য একে মৌলিক কারণ বললে ভুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা সকলকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-২৮:** ধন-সম্পদ ও উন্নতি অগ্রগতির ব্যাপারে কিছু লোক বলতে শুরু করেছে যে, এগুলো ভাগ্যের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যারা চালাক-চতুর, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পলিসি ও টেকনিক জানা আছে, তারাই নিজ গুনে এ জাতীয় উন্নতি করতে পারে এবং অঢেল সম্পদের অধিকারী বা বিশিষ্ট শিল্পপতি হওয়া তাদের জন্যে কোন ব্যাপারই নয়। তাদের চিন্তাধারা আল্লাহর দুশমন কারুনের চিন্তাধারার ন্যায়।[সূত্র : সূরা কাসাস, আয়াত -৭৮।]

কুরআনের বহু আয়াতে রিযিক ও ধন-দৌলতকে আল্লাহর ফায়সালার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, কোন একটি আয়াতেও মানুষের চেষ্টা-তদবিরের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি। সুতরাং তাদের এ বিশ্বাস কুফরী-আক্বীদা এর থেকে তাদের তওবা করা ফরয।

এই অধ্যায় যেসব ভ্রান্ত ও কুফরী আকীদার আলোচনা করা হলো, তার দ্বারা উদ্দেশ্য, মুসলমান ভাইদের ঈমান-আকীদার হেফাযত করা। প্রত্যেকে যেন এসব

ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে বেঁচে থাকতে পারেন। আল্লাহ না করুন, কেউ অজ্ঞতাবশত যদি এ ধরণের ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে থাকেন, তাহলে তিনি সেগুলো অন্তর থেকে ধুয়ে-মুছে উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা পরিহার করে খালিসভাবে তাওবা করে নিবেন।

**জরুরী হুশিয়ারি:** কেউ এই কিতাব পড়ে কারো মধ্যে এমন কুফরী আক্বীদা প্রত্যক্ষ করলে, যার সম্পর্কে এই কিতাবে কাফির বলা হয়নি। তাকে কাফির বলবেন না বা কাফির ফাতাওয়া দিবেন না। কারণ, কুফরের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে, কোনটা উপরের স্তরের, আবার কোনটা নিচের স্তরের। উপরের স্তরের কুফর কারো মধ্যে পাওয়া গেলে, সে ব্যক্তি কাফির ও বেদ্বীন হয়ে ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু নিম্নস্তরের কুফর কারো মধ্যে পাওয়া গেলে যদিও উক্ত আক্বীদা নিঃসন্দেহের কুফর এবং তার পোষণকারী স্পষ্টভাবে কফির না হলেও নিশ্চিতভাবে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ, বিদ‘আতী, ফাসিক ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত থেকে খারিজ। হাদীসে তাদেরকে ৭২ ফিরকার অন্তর্ভুক্ত ও জাহান্নামী বলা হয়েছে, কিন্তু কুফরের এসব স্তর নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নয়। একমাত্র বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ উলামা ও মুফতীগনই এগুলো নির্ণয় করতে পারেন। সুতরাং, যেসব আক্বীদা পোষণকারীকে এ কিতাবে কাফির বলা হয়নি, সে ধরণের কোন আকীদার হুকুম জানার প্রয়োজন পড়লে বিজ্ঞ উলামা ও মুফতীগণ থেকে জেনে নিবেন বলে আশা করি। প্রত্যেকে নিজে আন্দাজ-অনুমান করে দ্বীনের ব্যাপারে কিছু বলবেন না। এটা মহা অপরাধ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে “ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছে পড়ো না।” [সূত্র: সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৬।]

## আরো কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদা

**ভ্রান্ত আক্বীদা-২৯:** নব্য শিক্ষিতদের অনেকে ডারউইনের মতবাদ ‘বানর থেকে পর্যায়ক্রমে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে’- একথা বিশ্বাস করে। অনেকে কতক বিজ্ঞানীর অভিমত হিসেবে বিশ্বাস করে যে, সূর্য তার স্থানেই স্থির অবস্থান করছে। সূর্য ঘুরছে না। আবার অনেকে সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতির মধ্যে কোন প্রকার ক্ষতি বা আল্লাহর নাফরমানীর কথা মেনে নিতে চায় না। কেউবা জন্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে সুখ-শান্তি রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। অনেকে ইংরেজদের তৈরী পাঠ্যসূচীতে শিক্ষা গ্রহণ করার কারণে অনেক ধরণের পশ্চিমা দর্শন ও ফিলোসফিকে [যা সম্পূর্ণভাবে কুরআন-সুন্নাহবিরোধী] মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। এমনকি তাদের ইসলামের বন্ধন অতিদূর্বল ও ক্ষীণ হাওয়ায় তারা এগুলোকে ইসলামের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

তাদের এসব বিশ্বাস সর্বস্বই মারাত্মক ভুল। এসব ভুলের দরুন তারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অনেক  আয়াত ও হাদীসকেই অস্বীকার করে নিজের দ্বীন ও ঈমানকে নষ্ট করে ফেলেছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি এক ব্যক্তি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। [সূত্র: সূরা নিসা, আয়াত-১।]

এছাড়া বিভিন্ন আয়াতে মানবজাতিকে – يا بَنِيْ اَدَمَ ‘হে আদমের সন্তান!’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

পাঠক!চিন্তা করুন, আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন যে, আমি একজোড়া নর-নারী থেকে সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি এবং সেই নর হচ্ছেন হযরত আদম আ. ও নারী হচ্ছেন হযরত হাওয়া আ.। আর দুনিয়ার সমস্ত মানুষ হচ্ছে নবীর আওলাদ। এখন কোন অমুসলিম যদি বানর থেকে মানুষ তৈরির দাবী করে, তাহলে আমাদের বলার কি আছে? আমরা [মুসলমানগণ] এতটুকুই শুধু বলব যে, বংশতালিকা বা বংশপরম্পরা বর্ণনা করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। আজ হয়তো কেউ তার বংশপরম্পরা বানর থেকে বর্ণনা করছে, আগামীকাল কেউ তার বংশপরম্পরা শুকর থেকে বর্ণনা করবে। আমরা মুসলমান জাতি। আমাদেরও বংশপরম্পরা বর্ণনা করার অধিকার আছে। সেই হিসেবে আমরা বলব যে, আল্লাহ তা‘আলা ঈমানের দৌলতে আমাদেরকে হেফাযত করেছেন। তিনি আমাদেরকে কোন জানোয়ারের বাচ্চা না বানিয়ে তাঁর প্রিয়নবী হযরত আদম আ. এর সন্তান বানিয়েছেন।

সারকথা, যারা ডারউইনের মতবাদ বিশ্বাস করে, তারা কুরআনের এ সমস্ত আয়াত বিশ্বাস করে না। তেমনিভাবে যারা বিজ্ঞানীদের এ দর্শন ‘সূর্য ঘুরে না, বরং নিজের স্থানে স্থির রয়েছে’ বিশ্বাস করে, তারা সূরা ইয়াসীনের ৩৮ নং আয়াত। وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا

অর্থাৎ: “ সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে, বিশ্বাস করে না। যারা সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতির মধ্যে উন্নতির বিশ্বাস রাখে, তারা সূরা বাকারার ২৭৬ নং আয়াত। يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ অর্থাৎ: “ আল্লাহ তা‘আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করনে এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন” বিশ্বাস করে না। অথচ স্মরণ রাখা উচিৎ যে, কুরআনের কোন একটি আয়াত অবিশ্বাস করলে ঈমান চলে যায়।

এখানে শুধু নমুনা হিসাবে ২/৪ টা বিষয়ের উপর আলোচনা করা হলো। স্কুল-কলেজের পাঠ্য-পুস্তকে এ ধরণের অনেক বিষয় আছে, যা সরাসরি কুরআনের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ। সুতরাং সংশ্লিষ্ট লোকদের কর্তব্য হচ্ছে, এসব পশ্চিমা দর্শন বিশ্বাস না করা এবং এতে প্রভাবান্বিত না হয়ে হক্কানী উলামায়ে কিরাম থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে এতদসম্পর্কিত বিধান জেনে ঐ সকল ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে কলিজার টুকরো সন্তানদের দ্বীন-ঈমানের হেফাযত করা। দ্বীনদার শিক্ষকগণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেন।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-৩০:** নব্য শিক্ষিতদের অনেকে বিশ্বাস করে যে, পরকালের মুক্তি কেবলমাত্র ইসলামের ওপরই নির্ভরশীল নয়; বরং যে কোন ধর্ম অবলম্বন করে সেই ধর্মমতে চললে সে ব্যক্তি পরকালে নাজাত পাবে! চাই সে খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী হোক বা ইহুদী ধর্মের অনুসারী হোক, কিংবা হিন্দু ধর্মের অনুসারী হোক অথবা ইসলাম ধর্মের অনুসারী হোক। আবার অনেকে বলে, মানব সেবাই আসল ধর্ম অন্য কোন ধর্ম জরুরী নয়।

এসবই পবিত্র কুরআনের ঘোষণার পরিপন্থী ও গর্হিত আক্বীদা। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহর দরবারে মনোনীত দ্বীন একমাত্র ইসলাম।" [সূত্র: সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯।]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, "যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে, আল্লাহর দরবারে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।" [সূত্র: সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৫।]

সুতরাং, উল্লেখিত আক্বীদা কুরআনের পরিপন্থী হওয়ার কারণে তা কুফরী আক্বীদা। এ আক্বীদা নিয়ে যদি কেউ সারা জীবন প্রথম কাতারে নামায পড়ে এবং কোটি কোটি টাকা দান-খয়রাত করে, মানব সেবা করে বা বহুবার হজ্ব-উমরা আদায় করে, তারপরও সবই নিস্ফল-বেকার গণ্য হবে। ঈমান না থাকার দরুন এসব আমলের কোন বিনিময় সে আল্লাহর দরবারে পাবে না।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-৩১:** অধুনা অনেক লোক টুপি, দাড়ি, মিসওয়াক, আলেম-ওলামা, মসজিদ-মাদরাসাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এগুলোকে খুবই হেয় নজরে দেখে এবং এগুলোকে অনর্থক ও বেকার বলে মনে করে। তারা এগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

তাদের এ ভূমিকা খুবই মারাত্মক। এ সবই মুরতাদদের কাজ। শরী'আতের কোন বিষয় নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়-যদিও তা সামান্য কোন আমলই হোক না কেন। যেমন ধরুন, টুপি পরা সুন্নাত, ফরয নয়। কিন্তু কেউ যদি এই সুন্নাত নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তাহলে সে ঈমানহারা হয়ে মুরতাদ হয়ে

যাবে। অতএব, এ ব্যাপারে সকলকে সাবধান থাকতে হবে। [সূত্র : শরহে আক্বায়িদ, পৃষ্ঠা ১৬৭]

**ভ্রান্ত আক্বীদা- ৩২:** অনেক নব্য শিক্ষিত মুসলমান এমন রয়েছে, যারা পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রে প্রভাবিত হয়ে প্রচার করে থাকে যে, মুসলমানদের মুক্তির এখন একমাত্র পথ গণতন্ত্র, অথবা সমাজতন্ত্র, কিংবা অন্য কোন তন্ত্র-মন্ত্র। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এ যুগে ইসলামের মতো সেকেলে মতবাদ দিয়ে উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। তারা আরো বলে থাকে, আলিম সমাজই প্রগতির চাকাকে পিছনের দিকে টেনে রেখেছে। তারাই প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়।

তাদের এই আক্বীদা ও বিশ্বাস স্পষ্ট কুফরী আক্বীদা। [সূত্র : সূরা আনআম, আয়াত ১১৬।] কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের কামিয়াবী ও উন্নতির একমাত্র রাস্তা হচ্ছে ইসলাম। এটাই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরিকা। সেটাকে সেকেলে বলে প্রত্যাখ্যান করা, উলামায়ে কিরামকে হেয় মনে করা এবং গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের মতো কুফরী মতবাদকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করত: তা কায়িমের লক্ষ্যে প্রচার-প্রসার করা স্পষ্ট কুফরী কাজ। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে, উপরোক্ত মতবাদসমূহ জনগণ শোষণের হাতিয়ার। তারা হালাল-হারামের প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করে সুদ -ঘুষ ও নানা প্রকার অবৈধ পন্থায় যে উন্নতি করছে, এটাকে প্রকৃত পক্ষে কোন উন্নতি বলা যায় না। এসব মতবাদ গ্রহণ করা আল্লাহর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার নামান্তর।

আধুনিক যুগের শিক্ষিতরা সভ্যতা, ভদ্রতা ও উন্নতি-প্রগতি বলতে ইংল্যান্ড-আমেরিকা, চীন-জাপানের তথা কথিত সভ্যতা ও উন্নতি-প্রগতি বুঝিয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৃষ্টিতে বেদ্বীনদের ঐ ধরনের সভ্যতা চরম বেহায়াপনা ও নোংরামী, যা জানোয়ার ছাড়া কোন মানুষ থেকে কল্পনা করা যায় না। সুতরাং, মানুষ নামের পশুরা এটাকে উন্নতি বললেও আল্লাহ, রাসূল ও মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটা ধ্বংসের রাস্তা। যা কিছুদিন পরে তারাও মানতে বাধ্য হবে। রোম ও পারস্যের অস্তিত্ব বহু পূর্বে শেষ হয়েছে। রুশ-ব্রিটিশের আগ্রাসী থাবা কিছুদিন পূর্বে যেভাবে শেষ হয়েছে, তেমনিভাবে অবশিষ্ট মোড়লদের ঔদ্ধত্য ও দৌরাত্ম ও অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ শেষ হয়ে যাবে। তখন জ্ঞানপাপীদের চক্ষু উন্মোচিত হবে।

**ভ্রান্ত আক্বীদা-৩৩:** বর্তমানে মুসলমানদের ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগে অনেক খাজাবাবা ও ভাণ্ডারী দরবার শরীফ-এর ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক সরলপ্রাণ মুসলমান হক্কানী উলামায়ে কিরাম থেকে জিজ্ঞেস না করে দুনিয়ার সকল সুযোগ-সুবিধা ঠিক রেখে অতি সহজে বেহেশত লাভের আশায় তাদের

দরবারে ধর্ণা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ঐসব দুনিয়াদার, ভণ্ড, খাজা বাবাদের খপ্পরে পড়ে নিজের যতটুকু দ্বীনদারী ও ঈমান-আক্বীদা ছিল, তাও বিসর্জন দিয়ে দেয়। ঐসব বাবাদের অনেকে নামায-রোযার কোন ধার ধারে না। [তাদের ভাষায়] তাদের নাকি বাতেনীভাবে ঐসব ইবাদত-বন্দেগী আদায় হয়ে যায়। তাদের দরবারে শিরক-বিদআত ও গান-বাদ্য,বেপর্দা, মদ-গাঁজা ইত্যাদি চলতে থাকে। তারপরও নাকি তারা আল্লাহর বিশিষ্ট ওলী এবং অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী!

এ ধরণের বিশ্বাস ও কুফরী আক্বীদা। কারণ, শরী'আতের বিধান এই যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুমকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নকারী ব্যক্তিই একমাত্র আল্লাহর ওলী হতে পারেন। [সূত্র: সূরা ইউনুস, আয়াত ৬২।]

যে ব্যক্তি ইবাদত-বন্দেগীর ধার ধারে না, শিরক-বিদ'আত ও বিভিন্ন হারাম কাজের মধ্যে মশগুল থাকে, সে কখনো আল্লাহর ওলী হতে পারে না। চাই সে যত বড় অলৌকিক ঘটনা দেখাক না কেন, বা সে বাতাসে উড়তে সক্ষম হোক না কেন! এসব জিনিস আল্লাহর ওলী হওয়ার কোন দলিল নয়। কিয়ামতের পূর্বে যে 'কানা দাজ্জাল' আসবে সেও অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা মানুষদেরকে দেখাবে। অথচ সে আল্লাহর দুশমন। [সূত্র: তিরমিযী, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা -৪৮। মিশকাত শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৪৭৩।]

এ কথা ঠিক যে, সকলের নিজের আত্মার রোগসমূহের চিকিৎসার জন্যে প্রত্যেকেরই কোন হক্কানী বুযুর্গের সাহচর্য লাভ করা এবং আত্মার রোগের চিকিৎসা করা জরুরী। দিলের রোগের চিকিৎসা না করালে, এর একটা রোগের পরিণতিতে সমগ্র জীবনের ইবাদত-বন্দেগী বাতিল হয়ে যেতে পারে। যেমন, হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, কিয়ামতের দিন ইখলাসের অভাবে, রিয়ার কারণে সর্বপ্রথম একজন শহীদ, একজন আলিম ও একজন দানশীলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং, এ ব্যাপারে খুবই সর্তক দৃষ্টি রাখা জরুরী। কিন্তু বর্তমানে এ বিষয়টি সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। দ্বীনদার লোক বলতে যাদেরকে বোঝায়, তাদের থেকেও এটা বিদায় নিয়ে এখন বিলুপ্তির পথে আছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে তিনটি উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্যে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তা হচ্ছে-তাবলীগ, তা'লীম ও তাযকিয়া। এর মধ্যে তাযকিয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। [সূত্র: সূরা বাকারাহ, আয়াত ১২৯, সূরা জুমুআ, আয়াত-২।] এর জন্যে হক্কানী বুযুর্গের সাহচর্য লাভ করে আত্মশুদ্ধি করাকে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ফরযে আইন বলেছেন।[সূত্র: আল ইলমু ওয়াল উলামা, পৃষ্ঠা ১৮৭।]

হক্কানী বুযুর্গের আলামত হযরত থানভী রহ. ‘কসদুস সাবীল’ নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে হতে কয়েকটি নিম্নরূপ:

ক. যিনি মাদরাসায় পড়ে বা কোন হক্কানী বুযুর্গের সান্নিধ্যে থেকে দ্বীনের ওপর চলার জন্যে প্রয়োজনীয় ফরযে আইন পরিমাণ ইলম অর্জন করেছেন এবং তার প্রত্যেকটি কাজ শরী‘আত ও সুন্নাত মুতাবিক।

খ. যিনি কুফর, শিরক, বিদ‘আত, হারাম বা কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত নন এবং তিনি অর্থলোভীও নন। যেমন, তিনি তার পায়ে মুরীদকে সিজদার অনুমতি দেন না, ওরস করেন না, গানবাদ্য শুনেন না, মদ-গাঁজা পান করেন না, দাড়ি মুণ্ডন করেন না বা এক মুষ্টির চেয়ে কম করেন না, মহিলাদেরকে বেপর্দা অবস্থায় মুরীদ করা, বেপর্দাভাবে ঝাড়ফুঁক দেয়া, তাদের সাথে কথা বলা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকেন। এক কথায় শরী‘আত ও সুন্নাতপরিপন্থী কোন কাজ তিনি করেন না এবং মুরীদদেরকেও করতে দেন না।

গ. সমকালীন যুগের হক্কানী উলামায়ে কিরাম তাকে হক্কানী পীর বলে সমর্থন করেন এবং তাকে শ্রদ্ধা করেন। নিজেরা তার নিকট যাতায়াত করেন এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করেন ইত্যাদি।

ভণ্ড খাজাবাবাদের মাঝে এসবের কোন একটি আলামতও পাওয়া যায় না। তাহলে তারা কীভাবে আল্লাহর ওলী হতে পারে?

**ভ্রান্তি নিরসন**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের সামনে যে দ্বীন পেশ করেছিলেন, তা পরবর্তী উম্মতের নিকট পৌঁছানোর প্রধান দায়িত্ব পালন করেছেন সাহাবায়ে কিরাম রাযি.। সে হিসাবে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. উম্মতের নিকট দ্বীন পৌঁছার মূলভিত্তি। তাঁদের পর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও পর্যায়ক্রমে সমকালীন যুগের হক্কানী উলামায়ে কিরামের ওপর। আর সে জন্যেই ইসলাম বিদ্বেষীরা এসব মহামনীষীর পবিত্র চরিত্রকে কলুষিত করার জন্য বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করে তাদের চরিত্রে কালিমা লেপনের ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম রাযি. ও উলামায়ে কিরাম সম্পর্কে বিভিন্ন রকম ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেছে। যাতে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে নানা রকম সন্দেহে-সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং ইসলাম প্রচারের মূলভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে যায়। তাই মুসলিম উম্মাহকে এরূপ ভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে ‘ভ্রান্তি নিরসন’ নামে নিম্নে পৃথক তিনটি বিষয় সংযোজিত হলো।

**ভ্রান্তি নিরসন-১:** সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারায় (আয়াত ১৩ ও ১৩৭) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সাহাবায়ে কিরামকে দ্বীন ও ঈমানের কষ্টিপাথর ও নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন। একটি হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন-'আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র সমতুল্য'। এদের থেকে তোমরা যাকেই অনুসরণ করবে, হিদায়াত পেয়ে যাবে।' [সূত্রঃ মিশকাত শরীফ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা-৫৫৪]

এ হাদীসটি শব্দের সামান্য পার্থক্য সহকারে অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এসব সূত্রের মধ্য হতে কোনটির শুধু শব্দের ব্যাপারে কোন কোন মুহাদ্দিস কিছুটা আপত্তি করলেও তারা অর্থের ব্যাপারে কোন আপত্তি করেন নি। অথচ তাদের সে আপত্তিকে না বুঝে অনেকে এতদসম্পর্কে বর্ণিত সকল সূত্রকে বাতিল বলে প্রচার করে। এটা তাদের চরম মূর্খতা। কোন একটা সূত্রের উপর আপত্তির কারণে অবশিষ্ট সবগুলো সূত্র কখনো বাতিল হতে পারে না। তেমনিভাবে অবশিষ্ট সূত্রে প্রাপ্ত হাদীস সমূহও বানোয়াট হওয়া প্রমাণিত হয় না।

যা হোক, নমুনাস্বরূপ কয়েকটি আয়াত ও হাদীস ও পেশ করা হয়েছে, যার সারমর্ম হলো, সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠিস্বরূপ। তারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের জন্যে পথপ্রদর্শক ও আদর্শ। ঈমানের সাথে একবার যিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছেন, এবং ঈমানের সাথেই ইনতিকাল করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত সকল ওলী-বুযুর্গ মিলে তার সমতুল্য হবেন না। সুতরাং, এর দ্বারাই বোঝা যায় যে, তাদের মর্যাদা কত অধিক!

অপরদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা বা তাদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করা কিংবা তাদের বিরূপ সমালোচনা করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি তিনি বলেছেন- "আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।" আমার ইনতিকালের পর তোমরা তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। কেননা, যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসবে, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকে ভালোবাসার কারণেই তাদেরকে ভালোবাসবে। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে প্রকৃতপক্ষে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিল, তার গ্রেফতারী অতি নিকটেই। [সূত্র: মিশকাত শরীফ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৫৪।]

এর দ্বারা বোঝা যায়, সাহাবীগণের সমালোচনার করা কত বড় মারাত্মক অপরাধ! যে ব্যক্তি সাহাবীগণের সমালোচনার করলো, সে এটা প্রমাণ করে দিল যে, তার অন্তরে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বিদ্বেষ আছে। আর সেটার

বহিঃপ্রকাশের জন্যেই সে সাহাবীগণের সমালোচনার পথ বেছে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে হেফাজত করুন।

অপর একটি হাদীসে নবী পাক সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- "তোমরা যখন কাউকে সাহাবীগণের সমালোচনা করতে দেখ, তখন বলে দাও যে, তোমাদের ও সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট, তাদের ওপর অর্থাৎ সমালোচনাকারীদের ওপর আল্লাহর লানত।"

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন, একদিকে সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি। অপরদিকে তাদের সমালোচনা করা হারাম, অনেক ক্ষেত্রে কুফরও বটে। আর তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ও ভালোবাসা ঈমানের অংশ। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাগুলো তাদের মাধ্যমেই উম্মতের নিকট এসে পৌঁছেছে। এসব দিক লক্ষ্য করেই উলামায়ে কিরাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যে ইতিহাস মানুষ কর্তৃক রচিত, এর মধ্যে আবার অনেকগুলোই ইসলামের দুশমনদের দ্বারা লিখিত। সুতরাং, এসব ইতিহাস নির্ভর তথ্যের ওপর যাচাই-বাছাই ছাড়া পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করা অসম্ভব। তাই ইতিহাসের যে অংশটুকু কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সংঘাতপূর্ণ নয় এবং সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল, শুধুমাত্র ততটুকুই গ্রহণ করা হবে। অবশিষ্ট অংশ কোনক্রমেই গ্রহণ করা হবে না।

ঈমান-আকীদার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র এরই ওপর পরকালে মানুষের নাজাত ও মুক্তি নির্ভরশীল। সুতরাং, ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে ঈমানের ওপর আচড় আসতে দেওয়া কোন জ্ঞানী লোকের পক্ষে শোভা পায় না। ফলতঃ সাহাবীগণ নির্ভরযোগ্য গণ্য না হলে সম্পূর্ণ দ্বীনের বুনিয়াদই নষ্ট হয়ে যায়। কারণ আমরা দ্বীন পেয়েছি সাহাবীগণের মাধ্যমেই।

কেউ বলতে পারেন, বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত মা'য়িম রাযি.এর দ্বারা যিনা সংঘটিত হওয়া এবং তাকে পাথর মেরে হত্যা করার ঘটনা উল্লেখ আছে। তেমনিভাবে অপর এক সাহাবীর মদ্যপান এবং তাকে শাস্তিদানের কথা উল্লেখ আছে। আর উভয় ঘটনাই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে সাহাবীগণ কীভাবে সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন? তাছাড়া তাদের দ্বারাই তো সংঘটিত হয়েছে জংগে জামাল, জংগে সিফফীন এর ন্যায় ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। তাহলে তাদেরকে কিভাবে সত্যের মাপকাঠিরূপে মেনে নেওয়া যায়? তাদের এরূপ মন্তব্যের উত্তরে উলামায়ে কিরাম বলেন :

ক. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো সাহাবীগণ মাসুম বা নিষ্পাপ নন। তবে দ্বীনের জন্যে অকল্পনীয় ত্যাগ ও কুরবানীর কারণে কুরআনের বিভিন্ন

আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাদের মাগফিরাত ও জান্নাত প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন। [সূত্র: সূরা তাওবা, আয়াত -১০০।]

সুতরাং , তারা মাসুম না হলেও নিঃসন্দেহে তারা মাগফিরাত প্রাপ্ত ও জান্নাতী। তাই পরবর্তীদের জন্যে শুধ তাদের ভালো আলোচনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে; সমালোচনার অনুমতি কোনক্রমেই দেওয়া হয়নি। এর কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রত্যেকে নিজের দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে যে, সে দ্বীনের জন্যে কতটুকু কুরবানী করেছে। নিজেকে কতটুকু গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রতি নিয়ত যে ব্যক্তি ভুল করেই চলেছে, তার জন্য কি মাগফিরাত প্রাপ্ত জান্নাতী মনীষীবৃন্দের সমালোচনা করা শোভা পায়? দ্বীন বুঝতে বা কায়িম করতে কি এ ধরণের আলোচনার কোন প্রয়োজন পড়ে? আর যদি তা না-ই হয়, তাহলে কোন প্রয়োজনে তারা নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলো? সমুদ্রে নাপাক পড়লে, পেশাব পড়লে যেমন সমুদ্র নাপাক হয় না, বরং নাপাক তার অস্তিত্ব হারিয়ে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি সাহাবীগণ তাদের অসাধারণ কুরবানীর বদৌলতে ছিলেন নেকীর সমুদ্র। সুতরাং তাদের দু’একজনের জীবনে যদি অসাবধানতা বশত দু’একটি গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে সে কারণে তাদের সমগ্র জীবনের কুরবানী থেকে চক্ষু বন্ধ করে তাদের সমালোচনা করা কোনক্রমেই বৈধ হতে পারে না।

খ. লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরামের রাযি. মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন যদি কোন গুনাহ করে ফেলেন, তাহলে তাতে কি এ বিশাল জামাতের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে এবং তাতে কি তাদের সত্যের মাপকাঠি ও উম্মতের পথপ্রদর্শক হওয়া বাতিল হয়ে যায়? দু’একজন থেকে যে ভুল হয়েছে, তাতো হাদীসে ভুল হিসেবে বা গুনাহ হিসেবে চিহ্নিতই করা হয়েছে। সুতরাং সেই ভুলের বিষয়ে তাদেরকে অনুকরণ বা অনুসরণের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। আর এরূপ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে তো কত হিকমত নিহিত রয়েছে, তা আল্লাহ তা‘আলাই ভালো জানেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিল শুধু আল্লাহর আহকাম বর্ণনা করার জন্য নয়; বরং প্রত্যেক আহকামের বাস্তবরূপ উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তাই খোদা না করুন, যদি কোন রাষ্ট্রে ইসলামী হুকমত কায়িম থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তির থেকে যিনা বা মদপানের অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়, তা প্রমাণ করার পদ্ধতি এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার শাস্তি প্রয়োগের নিয়ম কি হবে, এটা উম্মতের সামনে আসার জন্য এরূপ দু’একটি ঘটনা পথ নির্দেশনারই শামিল। তাছাড়া একজন মুমিন থেকে যদি ভুলক্রমে বা শয়তানের প্রবঞ্চনায় গুনাহ হয়ে যায়, তখন সেই ঈমানদারদের মানসিক অবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, এবং গুনাহ থেকে নিজেকে পাক-পবিত্র করার জন্যে কতটুকু পেরেশান হওয়া উচিত, এরও একটা নমুনা সেই ঘটনাসমূহ দ্বারা স্থাপিত হয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য করলে এরূপ দু’একটি ঘটনার হিকমত বোঝা

যায় এবং একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ঐ ভুলের ব্যাপারে উম্মত তাদের অনুকরণ করবে না বটে, কিন্তু ঐ অবস্থায় তার মানসিক অবস্থা ও খোদার প্রতি ভয়-ভীতি কিরূপ প্রকাশ পাওয়া উচিত, সে ব্যাপারে উক্ত সাহাবী তার জন্যে দৃষ্টান্ত এবং অনুকরণীয় হবেন। সুবাহানাল্লাহ! আল্লাহর কাজের মধ্যে কত হিকমত থাকতে পারে! হযরত মা'য়িয রাযি. থেকে যিনা হওয়ার পর তিনি নিজেই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে বললেন 'হে আল্লাহর নবী! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি । আমাকে পবিত্র করুন!' অথচ তিনি নিজে না বললে এ ঘটনা প্রকাশ পেত না। একমাত্র খোদার ভয়ে তিনি এত পেরেশান হয়েছিলেন যে, নিজেকে পাক-পবিত্র করার জন্যে নিজেই অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন মা'য়িয তুমি হয়তো তাকে স্পর্শ করেছ বা চুমো দিয়েছ? তিনি বললেন-না, আমি যিনাই করে ফেলেছি। চারবার স্বীকারোক্তির পর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সঙ্গেসার করার বা পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তিনি অপরাধ করেছিলেন এ কথা ঠিক, কিন্তু তারপরও তিনি আমাদের ন্যায় অপরাধকারী সকল উম্মতের জন্যে গুনাহ মাফ করানোর ব্যাপারে নমুনা বা আদর্শ হয়ে আছেন।

গ. সাহাবা রাযি. কর্তৃক জংগে জামাল, জংগে সিফফীন সংঘটিত হয়েছিল- একথা ঠিক, কিন্তু কেউ কি বলতে পারবে যে, তারা ক্ষমতা দখলের জন্য বা দুনিয়াবী কোন স্বার্থে এসব যুদ্ধ করেছিলেন? এ সম্পর্কে যাদের যথার্থ জ্ঞান রয়েছে, তারা সকলেই স্বীকার করবেন যে, উভয় জামা'আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর বিধান কায়িম করা। আর এ জন্যে তারা সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সাহাবীগণের উভয় জামা'আতের মাঝে মুনাফিক 'আবদুল্লাহ বিন সাবা'র বাহিনী এমনভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছিল, যা থেকে পরিত্রান পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। এই ক্ষুদ্র পরিসরে সে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সারকথা, সাহাবীগণের উভয় দলের মধ্যে কোন দলই দুনিয়াবি স্বার্থে এসব যুদ্ধ করেন নি। উভয় দলেরই উদ্দেশ্যই ছিল দ্বীন। আপাতদৃষ্টিতে একদলের সিদ্ধান্ত সঠিক মনে হলে, অপর দলের সিদ্ধান্তকে ভুল বলে সমালোচনা করা যাবে না। কারণ এটা ভুল গণ্য হলেও তা ছিল ইজতিহাদী ভুল-যা ক্ষমার্হ। এ কারণে উভয় জামা'আত থেকে যারা সেসব যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাদের সকলকে শহীদ বলা হয় এবং বহু বছর পর বিশেষ কারণে যখন তাদের কবর খনন করা হয়, তখন তাদের লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। [সূত্র : আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৫৯।] কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে এটা শাহাদাতের আলামত। তাদের এই শাহাদত প্রমাণ করে যে, তারা দুনিয়ার লোভে এসব যুদ্ধ করেন নি। বরং দ্বীনের জন্যে করেছিলেন।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এসব ঘটনা আল্লাহ তা‘আলার ইলমে অবশ্যই ছিল এবং সামনে রেখেই তিনি সাহাবীগণের ব্যাপারে রাজি হওয়ার এবং তাদের জান্নাতী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এরপরও আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই মহান সাহাবীগণের সমালোচনা ও দোষচর্চার কি অধিকার থাকতে পারে? প্রত্যেকে যদি নিজের দোষ সংশোধনের চিন্তা করে, তাহলে কেউ এমন মহান ব্যক্তিবর্গের দোষচর্চা তো দূরের কথা, একজন সাধারণ ও নিম্নস্তরের মুসলমানের দোষচর্চায়ও লিপ্ত হতে পারে না। উপরন্তু এরূপ আলোচনা ‘গীবত’ হওয়ার কারণে শরী‘আতের দৃষ্টিতে হারাম। যারা নিজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, নিজের ঈমান-আকীদার খবরও যাদের কাছে নেই, তারাই এরূপ হারামে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারে।

প্রত্যেক নিজের বাপ-দাদার ব্যাপারে কত হুঁশিয়ার! কেউ তার বাপ-দাদার অন্যায় সমালোচনা বরদাশত করতে পারে না। অথচ সাহাবীগণের ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণ করা আমাদের পিতা-মাতা ও দাদা-নানার ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণের চেয়েও লক্ষ-কোটি গুণ বেশি জরুরী। মুসলমান হয়েও কিভাবে সাহাবীগণের দোষচর্চা করতে পারে, বা দোষচর্চা শুনে বরদাশত করতে পারে, তা বোধগম্য নয়।

**ভ্রান্তি নিরসন-২:** বর্তমানে অনেক নব্যশিক্ষিত লোক আলেম সমাজের বিরুদ্ধে বুঝে না বুঝে তাদের গুরুদের অনুকরণে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কর সমালোচনা করে থাকে। অথচ উলামায়ে কিরাম দ্বীনের কাজ করছেন, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওয়ারিশ, তাই তাদেরকে গালি দেওয়া, তাদেরকে হেয় করা, তাদের সমালোচনা করা শরী‘আতের দৃষ্টিতে কুফরী কাজ। এতে ঈমান চলে যায়। আর ঈমান চলে গেলে অতীত জীবনের সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যেতে পারে, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে। মৃত্যুর পর কবরে তাদের চেহারা কিবলার দিক থেকে আপনা আপনি অন্য দিকে ফিরে যাবে বলে হাদীসে এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা সকলকে হেফাযত করুন।

তাদের সেই অভিযোগ মূলত ভ্রান্তিপ্রসূত। সেই ভ্রান্তি নিরসনে তাদের উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের জবাব নিম্নে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আমরা অভিযোগগুলো উল্লেখপূর্বক তার জবাব এজন্যে প্রদান করছি, যাতে করে তাদের অভিযোগের যবনিকাপাত হয় এবং এরদ্বারা আলেম সমাজের দোষারোপ করা থেকে দূরে থেকে সরল প্রাণ মুসলমানগণ নিজেদের ঈমান বাঁচাতে পারেন।

**প্রথম অভিযোগ:** তারা অভিযোগ করে, উলামায়ে কিরাম মাদরাসার মধ্যে শুধু কুরআন-হাদীস কেন শিক্ষা দেয়? এর সাথে বিভিন্ন রকম কারিগরি বা হস্ত শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা দিতে তাদের বাধা কোথায়?

**জবাব:** অভিযোগকারীরা মূলত কওমী মাদরাসায় শিক্ষার লক্ষ্যে-উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বে-খবর। এজন্য তাদের মধ্যে এই আপত্তি উঠেছে। তাহলে শুনুন, দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক দ্বারা পরিচালিত না হলে দুনিয়াতে কোন জিনিসই ভালোভাবে টিকে থাকতে পারে না। বরং কিছুদিন পরেই তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।। দ্বীন ইসলাম মানবজাতির জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াও আখিরাতের কামিয়াবির জন্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত । সুতরাং, এ নেয়ামতের স্থায়িত্বের জন্যে প্রত্যেক জামানায়, প্রত্যেক এলাকায় বিজ্ঞ ও পারদর্শী হক্কানী উলামায়ে কিরামের বড় একটি জামাত বিদ্যমান থেকে সহীহভাবে দ্বীনের সকল বিভাগে খিদমত আনজাম দেওয়া জরুরী। কওমী মাদরাসারগুলোর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম মিল্লাতের এ দ্বীনি দায়িত্ব ও চাহিদা পূরণের জন্য হক্কানী ও আল্লাহওয়ালা বিজ্ঞ উলামা দল সৃষ্টি করা, যাতে দ্বীন ইসলামের স্থায়িত্ব ও প্রচার প্রসারে এবং মুসলমানদের দ্বীনি প্রয়োজন মিটাতে কোন ক্ষেত্রে কোন রকম সমস্যার সৃষ্টি না হয়। আল-হামদুলিল্লাহ, এ লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কওমী মাদরাসাসমূহ নীরব আন্দোলন  চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারই বদৌলতে চরম ফিতনার এ যুগে এখনো মুসলমানগণ সহীহ দ্বীন- ঈমান নিয়ে টিকে আছেন। এখন যদি কওমী মাদরাসাসমূহের সিলেবাসে হস্তশিল্প, কারিগর প্রশিক্ষণ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আর বিজ্ঞ পারদর্শী উলামা সৃষ্টি হবে না। যেমন সরকারী  মাদরাসা থেকে হচ্ছে না এবং এটা কখনো সম্ভব নয়। কারণ, কুরআন হাদীসের জ্ঞান অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুগভীর। প্রখর ছাত্র যদি একনিষ্ঠভাবে এই জ্ঞান অধ্যয়ন করে, তাহলে সে এটা আয়ত্তে আনতে পারবে। কিন্তু দ্বীনি ইলমের সাথে দুনিয়াবি বিষয়ের মিশ্রণ ঘটালে, তার পক্ষে আর কোনভাবেই এটা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কথায় বলে, 'তোলা দুধে পোলা বাঁচে না।' সুতরাং তখন যেসব নামকে ওয়াস্তে আলেম তৈরী হবে, তাদের দ্বারা দ্বীন ইসলাম টিকে থাকবে না এবং তাদের থেকে জনগণ সহীহ দ্বীনও পাবে না। তাই দ্বীন রক্ষার স্বার্থেই কওমী মাদরাসা কুটির শিল্প, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রভৃতি প্রবেশ করানো হয় না।

বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে অভিযোগকারীদের নিকট আমাদের প্রশ্ন যে, আপনারা এ ধরণের প্রস্তাব কেন দিচ্ছেন না যে, মেডিকেল কলেজে শুধু ডাক্তার তৈরী করা হচ্ছে কেন? সেখানে কিছু কমার্সের সাবজেক্টও ঢুকানো হোক। যাতে তাদের মধ্যে দু ধরণের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। তেমনিভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ- ইউনিভার্সিটিগুলোতে মেডিকেল সায়েন্স প্রবেশ করানো হোক। যাতে করে তারা  ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সাথে সাথে ডাক্তারও হতে পারে। ফলে তারা জাতির জন্যে দ্বিগুণ খিদমত আনজাম দিতে পারবে।

আজ পর্যন্ত কোন পাগলও এ ধরণের চিন্তা করেছি কি? নিশ্চয়ই নয় কারণ কী? কারণ এটাই যে, এতে দুটোর কোনটাই ভালোভাবে শিক্ষা লাভ করা যাবে না। তাহলে মাদরাসার ব্যাপারে আপনাদের এ ধরণের বেওকুফি প্রস্তাব কেন?

আসল কথা হচ্ছে, সেই অভিযোগকারীরা দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। জেনে রাখুন, সকলের জন্য ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া জরুরী নয়; কিন্তু প্রয়োজনীয় ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেকের ওপর ফরয। প্রত্যেক মুসলিম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অর্থনীতিবিদের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরয। কিন্তু কোন আলেমের জন্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া জরুরী নয়, বরং এটা সমীচীনও নয়। কারণ দুই লাইনের খিদমত কেউ কখনো একসঙ্গে আনজাম দিতে পারবে না। যে কোন একটা পূর্ণভাবে পাঠ করলে, অন্যটা বাদ পড়তে বাধ্য। সুতরাং উলামায়ে কিরামকে এ ধরণের অনর্থক পরামর্শ না দিয়ে তারা যদি স্কুল-কলেজে গিয়ে সেখানকার সিলেবাসে ফরযে আইন পরিমাণ ইলমে দ্বীন শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ দেন তাহলে সেটা হবে সত্যিকার অর্থে মুসলিম জাতির কল্যাণ কামনা। তাতে মুসলিম ছেলেদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাযত হবে। মুসলিম সন্তানরা খৃষ্টানী ও হিন্দুয়ানী কৃষ্টি-কালচারে প্রভাবিত বা প্ররোচিত না হয়ে ইসলামের দিকেই ধাবিত হতে থাকবে। বর্তমানে যে মুসলমান ও হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান, মুসলমান ও নাস্তিকের মাঝে হারামভাবে বিয়ে-শাদী হচ্ছে, তা দ্বীনি ইলম বিবর্জিত ভ্রান্ত শিক্ষানীতিরই কুফল। কোন জাতির শিক্ষানীতি যদি ভ্রান্ত হয় এবং শিক্ষার নামে কুশিক্ষা চলতে থাকে, তাহলে সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই জাতিকে  সেই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হোন এবং উলামায়ে কিরাম সম্পর্কে অযৌক্তিক চিন্তাধারা পরিত্যাগ করুন।

**দ্বিতীয় অভিযোগ:** আলেমগণ শুধু মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ আর ওয়াজ-নসিহত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন কেন? তারা কি জাতির জন্যে কিছু খিদমত আনজাম দিতে পারে না? তারা ইচ্ছা করলে বিভিন্ন অফিস-আদালতে ব্যবসা-বাণিজ্যে, মিল-ফ্যাক্টরীতে শ্রম দিতে পারতেন! তাতে জাতির অনেক উপকার হতো।

**জবাব:** কিছু লোক  কওমী মাদরাসায় পড়ে দ্বীনি লাইনে পারদর্শী হয়েছেন, আলেম হয়েছেন, তেমনি আরো কিছু লোক জেনারেল লাইনে পড়ে পারদর্শী হয়ে কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ অর্থনীতিবিদ ইত্যাদি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এখন কি কেউ প্রশ্ন তুলবে যে, ডাক্তাররা শুধু হাসপাতালে আর ক্লিনিকে কেন ব্যস্ত থাকবে? তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে, মিল-কারখানায় শ্রম দিলে তো জাতির অনেক উপকার হতো! নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন কেউ করবে না। কারণ, ডাক্তার এই কাজ শুরু করলে জাতি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। ঠিক তেমনিভাবে উলামায়ে কিরাম যদি মিল-ফ্যাক্টরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে জাতি বিনা

হিদায়াতে ঈমানহারা হবে। তারা ইলমে দ্বীনের সেবা থেকে বঞ্চিত হলে, নিঃসন্দেহে বিপথগামী হয়ে জাহান্নামের পথে অগ্রসর হবে। জাতিকে সেই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতেই আলেম-উলামাগণ দ্বীনের যিম্মাদারী নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

তদুপরি আলেমগণ জাগতিক উন্নতির মাধ্যমও বটে। কারণ, একটি হাদীসে পাকের সারকথা হলো. 'কিছু লোক যে দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদেরকে উসিলা করে আল্লাহ তা'আলা সকলকে প্রতিপালন করছেন 'অন্য এক হাদীসের সারমর্ম হলো, 'আলেম ও তালেবে ইলমের মাধ্যমে দ্বীন টিকে থাকার ওপরই জগতের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।' বলা বাহুল্য, আলেম-উলামা ও তালিবে ইলমদের দ্বীনি খিদমতের বদৌলতেই আল্লাহ তা'আলা জমিনে ফসল দিচ্ছেন, ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় বরকত দিচ্ছেন, কল-কারখানায় উন্নতি দান করছেন। এক কথায় চীন, রাশিয়া, জাপান, জার্মান, ইংল্যান্ড, আমেরিকাসহ সারা বিশ্ব টিকে আছে উলামায়ে কিরামের দ্বীনি খিদমতের উসিলায়। যেদিন এ দ্বীনি খিদমত বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিন দুনিয়া আর টিকে থাকবে না। বরং সেদিন মহাপ্রলয় বা কিয়ামত সংঘটিত হয়ে সব ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

তাছাড়া আরো লক্ষ্য করুন, সংসদ সদস্যগণ মিল-ফ্যাক্টরীতে যোগদান করলে যেমন দেশ চলবে না, তেমনিভাবে উলামায়ে কিরাম জনগণের দ্বীনি খিদমত বাদ দিয়ে দুনিয়াবি কাজে লাগলে দুনিয়াও অচল হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। যারা মুসলমান, কুরআন-হাদীস স্বীকার করেন, তাদের সম্বিৎ ফেরাবার জন্যে আমরা এসব কথা পেশ করলাম। শরী'আতের বিরুদ্ধাচরণকারী অবাধ্য নাস্তিক-মুরতাদের সাথে আমাদের কোন তর্ক-বিতর্ক নেই।

**তৃতীয় অভিযোগ:** আলেম সমাজ পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকা পছন্দ করেন কেন? তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে বা দুনিয়াবী অন্য কোন পেশা অবলম্বন করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে চলতে পারেন না?

**জবাব:** দুনিয়াবি শিক্ষায় পারদর্শী ও বড় বড় ডিগ্রিধারী লোকেরা অনেক শ্রম, সময় ও পয়সা ব্যয় করে বিভিন্ন লাইনে পারদর্শী হয়ে সেই লাইনে জাতির সেবা করছেন এবং জাতির নিকট থেকে তার বিনিময় গ্রহণ করে তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করছেন। এটাই সমগ্র বিশ্বের একটা সাধারণ নিয়ম। প্রত্যেকে তার লাইন অনুযায়ী জাতিকে সেবা করে বিনিময় গ্রহণ করবেন-এর মধ্যে দোষের কিছু নেই এবং এ জন্যে যারা নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাদেরকে কেউ পরজীবী বলে না। তাহলে প্রশ্ন হলো, উলামায়ে কিরাম সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন এবং তাদের দক্ষতা অনুযায়ী জনগণের দ্বীনি সেবা ও খিদমতের জন্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, এর বিনিময় হিসাবে জনগণ থেকে হালালভাবে

কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে, কেন তাদেরকে পরজীবী বলা হবে? কওম ও জাতির পক্ষ থেকে এটা কি আলেম সমাজের প্রতি দয়া বা করুণা? তারা কি জাতির কম গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আনজাম দিচ্ছেন? নাকি অল্প পরিশ্রমে অধিক বিনিময় গ্রহণ করছেন? বরং আলেমগণ জাতির বিরাট খিদমত আনজাম দিচ্ছেন। দুনিয়াও আখিরাতের কল্যাণের রাস্তা একমাত্র উলামায়ে কিরামই দেখাচ্ছেন। মানুষকে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতের যোগ্য হওয়ার পথ প্রদর্শন করেছেন। তাছাড়া দুনিয়াতে এখনো লজ্জা-শরম বিবাহ-শাদী, পাক-পবিত্রতা, আমানতদারি-সততা যতটুকু বিদ্যমান আছে, তা একমাত্র উলামায়ে কিরামেরই অবদান। এর চেয়ে বড় খিদমত আর কি হতে পারে? এর তুলনায় অন্যদের যতরকম ক্ষণস্থায়ী ও নগণ্য খিদমতের কতটুকু মূল্য আছে? উলামায়ে কিরাম যথেষ্ট শ্রম দিয়ে কেবলমাত্র জীবনধারণ উপযোগী স্বল্প পারিশ্রমিক গ্রহণ করছেন। তাঁরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষকদের তুলনায় অতি সামান্য বিনিময় নিয়ে থাকেন। তারপরও অযথা এ আপত্তি কেন? আলেমগণের সম্পর্কে এ ধরণের অভিযোগ উত্থাপন জাতির জন্যে বড়ই পরিতাপের বিষয়। এর দ্বারা দ্বীনের কাজের গুরুত্বকে ছোট নজরে দেখা হয়, যা ঈমানের জন্যে ক্ষতিকর। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সহীহ ও সঠিক বিবেক বুদ্ধি দান করুন।

**ভ্রান্তি নিরসন-৩:** অনেকে বলে থাকে যে, শুনেছি, হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'টি কিতাব বা দফতর আছে। তার একটির মধ্যে শুধু জান্নাতীদের নাম আছে। আর অপরটির মধ্যে আছে জাহান্নামীদের নাম এবং উভয় খাতার নামগুলো যোগ করে মোটসংখ্যা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে কোন হেরফের বা কমবেশি হবে না। তাহলে প্রশ্ন হয়ে যে, সবকিছু যদি আগেই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের কষ্ট করে আর আমল করার প্রয়োজন কি? তাছাড়া আমল করেই বা লাভ কী? ফায়সালা তো আগেই হয়ে গেছে।

**জবাব:** আপনি যে হাদীসটি শুনেছেন, তা সহীহ ও সঠিক। হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে উল্লেখিত হাদীসটির ব্যাপারে নিজে নিজে কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা উচিত নয়। কারণ তাকদীরের ব্যাপারে নিজের আকুল-বুদ্ধি দ্বারা গবেষণা করা বা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া অথবা বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা শরী'আতে নিষেধ। একথা ঠিক যে, আল্লাহ তা'আলা তার পরিপূর্ণ জ্ঞান ও ইলমের দ্বারা লিখে রেখেছেন যে, নিজের এখতিয়ার অনুযায়ী আমল করে কোন বান্দা জান্নাতের বাসিন্দা হবে, আর কোন বান্দা হবে জাহান্নামের বাসিন্দা। তবে তিনি এরূপ কেন লিখে রেখেছেন, তা তিনিই ভালো জানেন। এর মধ্যে অনেক হিকমত নিহিত রয়েছে। আমাদের শুধু এতটুকুই জানতে হবে যে, এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী? এর চেয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। এ ব্যাপারে বান্দার যিম্মাদারী হলো, আল্লাহ তা'আলার এই

GET IT ON Google Play
www.darsemansoor.com
Download on the App Store

ফায়সালার ওপর ঈমান আনা এবং বাস্তবিক পক্ষে যে দু'টি কিতাব তৈরী আছে, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা। এতটুকু করলে আমাদের দায়িত্ব আদায় হয়ে গেল। এর ওপর ভিত্তি করে আমল না করা বা বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করা আমাদের দায়িত্ব বহির্ভূত বা অনধিকার চর্চার শামিল।

সারকথা, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, উক্ত দুই কিতাবের ওপর ঈমান রাখা এবং নিজের ইখতিয়ার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম ও বিধি নিষেধ বাস্তবায়ন করা। কারণ, উক্ত কিতাবদ্বয়ে কী লেখা আছে, তা আমাদের জানা নেই। তাছাড়া সেই লেখা দ্বারা আমাদের ইখতিয়ার ও শক্তি তো নষ্ট হয়ে যায় নি! সুতরাং, কিতাবে যা-ই লেখা থাকুক, আমাদের আমল করে যেতে হবে। এটাই বান্দার বন্দেগী ও তার দায়িত্ব। এরই মধ্যে তার সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। উক্ত হাদীস শুনে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, স্বয়ং সাহাবায়ে কিরাম রাযি. ও একই প্রশ্ন করেছিলেন। তার জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ভরসা করে বসে না থেকে আমল করতে বলেছিলেন। কারণ আমল বান্দার ইখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

উক্ত কিতাব দুটি সম্পর্কে একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে- আশা করা যায় যে, এর দ্বারা বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন, একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম বাদশাহের দরবারে বিভিন্ন লোকের যাতায়াত ও যোগাযোগ আছে। কেউ বাদশাহকে দ্বীনি ব্যাপারে সহযোগিতা করতে আসেন এবং তার দ্বীনদারীর কারণে বাদশাহ তাকে মুহাব্বত ও শ্রদ্ধা করেন। আবার অনেকে নিজের হীন স্বার্থ আদায়ের জন্যে বাদশাহের প্রতি বাহ্যত মুহাব্বত প্রদর্শন করবেন। এক সময় বাদশাহ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, প্রকৃত বাদশাহপ্রেমীদের পুরুষ্কৃত করবেন। কিন্তু সমস্যা হলো, নকল মুহাব্বতকারীরা দুর্নাম রটাবে যে, বাদশাহ মহোদয় আমাদের প্রতি ইনসাফ করলেন না। বাস্তবে আমরাও তাকে ভালোবাসি, কিন্তু তিনি আমাদেরকে পুরষ্কার না দিয়ে অন্যদেরকে দিলেন। এ সমস্যা থেকে বাঁচার জন্যে বাদশাহ একটা হিকমত অবলম্বন করলেন। বাদশাহ বললেন-১ম দফতরে যাদের নাম এসেছে, তাদেরকে নির্দিষ্ট তারিখে আমি পুরুষ্কৃত করব। আর ২য় দফতরে যাদের নাম এসেছে, তাদেরকে নির্দিষ্ট তারিখে আমি শাস্তি প্রদান করব এবং উভয় দফতর চূড়ান্ত করে শেষে মোটসংখ্যা লিখে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, এর মধ্যে পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। বাদশাহের এই ঘোষণার পর প্রকৃত বাদশাহপ্রেমীগণ তাদের আচার-আচরণ ও দরবারে যাতায়াতের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন করলেন না। তারা বললেন যে, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে এই আল্লাহওয়ালা বাদশাহকে মুহাব্বত করছি এবং তার কাজে সহযোগিতা করছি। সুতরাং, আমরা নেক কাজ করেই যাব। চাই বাদশাহ আমাদেরকে পুরষ্কৃত করুন বা শাস্তি প্রদান করুন, এটা বাদশাহের নিজস্ব ব্যাপার। আর স্বার্থান্বেষী মহল

বাদশাহের ঘোষণার পরে বাদশাহের দরবারে আসা-যাওয়া ও সহযোগিতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিল। তারা বলতে লাগলো যে, দুটি দফতর যখন তৈরী হয়ে গেছে, তাহলে এখন দরবারে যাতায়াত বৃথা। কারণ, প্রথম দফতরে নাম থাকলে সর্বাবস্থায় পুরষ্কার পাওয়া যাবে। আর দ্বিতীয় দফতরে নাম থাকলে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। সুতরাং দরবারে যাওয়া না যাওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কাজেই দরবারে গিয়ে সময় নষ্ট না করে নিজের কাজ করাই ভালো। এর পরে নির্দিষ্ট তারিকে দেখা গেল যে, যারা দফতরের ওপর ভরসা করে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিল তারা তাদের অপরাধের শাস্তি পেয়েছে। আর যারা দফতরের ওপর নির্ভর না করে নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছে, তারা সকলেই তাদের খালেস মুহাব্বতের কারণে পুরষ্কৃত হয়েছেন। এটা হলো উপরোক্ত বিষয়ের একটি উদাহরণ। এর ওপর ভিত্তি করে আমরা আল্লাহ তা'আলার দুই কিতাবের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা রুহের জগতে প্রথম যখন সকলকে জমা করেছিলেন, তখনই নিজের ইলম মুতাবিক এক দলকে জান্নাতে, আরেক দলকে জাহান্নামে পাঠাতে পারতেন, কিন্তু এমতাবস্থায় কাফির-মুশরিকদের আল্লাহর বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সুযোগ থাকতো যে, আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে আমল করার সুযোগ দিলে আমরা অন্যদের থেকে বেশি আমল করতাম। কিন্তু আল্লাহ তো আমাদেরকে সুযোগই দিলেন  না। কাজেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলম দ্বারা ফায়সালা না করে সকলকে আমলের সুযোগ দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং উভয় দফতরের কথা ঘোষণা করেছেন। এখন দুনিয়াতে যারা দফতরের ওপর ঈমান তো রাখবে, কিন্তু দফতরের ভরসায় আমল পরিত্যাগ করবে না, হাশরের ময়দানে দেখা যাবে যে, শুধু তাদেরই নাম জান্নাতী দফতরে লেখা আছে। আর যারা দফতরের ওপর নির্ভর করে আমল করেনি, দুনিয়ার ব্যাপারে তারা খুব বুদ্ধিমান হলেও আখিরাতের বিষয়ে বড়ই অলস । অথচ যুক্তি-তর্কে খুব পারদর্শী। হাশরের ময়দানে দেখা যাবে যে, এমন লোকগুলোর নাম জাহান্নামের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহর ও কিতাবদ্বয়ের ওপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেয়া যাবে না, বরং আমল করতে থাকতে হবে। তাহলেই পরকালে জান্নাত লাভে সক্ষম হওয়া যাবে।

সমাপ্ত

হযরতওয়ালার "কিতাবুল ঈমান" কিতাবের ৩য় অধ্যায় থেকে সংকলিত